বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না

●

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : অমরেশ গুহ রায় : প্রেমাঙ্কুর আতর্থী : গৌরী বসু : কালীপদ চট্টোপাধ্যায় : রেবা দাস : জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচী : শৈলেন ভট্টাচার্য : কিষণচাঁদ বর্মণ : ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী : গোপাল ভৌমিক : শান্তিলতা বসু : ডাঃ কুঞ্জেশ্বর মিশ্র : পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : চিত্তরঞ্জন দেব : নলিনীকুমার ভদ্র : সুচেতা গুপ্ত : শ্রীলতা বন্দ্যোপাধ্যায় : মন্মথকুমার চৌধুরী : সত্যভূষণ সেন : 'কাফের' : লিলি দে : সমরেন্দ্র-কিশোর বসু : পরিমল গোস্বামী

●

প্রজ্ঞা প্রকাশনী
১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
। কলিকাতা-৩ ।

॥ সূচী ॥

গেল। অবসন্ন দেহে ইজি-চেয়ার থেকে ঘাড় তুলে তিনি দেখলেন, ঘড়ির পেণ্ডুলামটা আস্তে আস্তে থেমে গেল। নজরে পড়লো, ঘড়িতে রাত দশটা বেজে চার মিনিট হয়েছে···ঘড়ির কাঁটা সেইখানেই থেমে গেল।···

একটা অব্যক্ত অস্বস্তি মিসেস্ গ্রেগরীকে চঞ্চল করে তুলল। ইজি-চেয়ার থেকে উঠে তিনি ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। হঠাৎ কি যে হলো, কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না। ডাক্তার ডাকবেন? কিন্তু ডাক্তারকে কি বলবেন? দেহের মধ্যে বিশেষ কোন্ জায়গায় কি যাতনা হচ্ছে, নিজেই ঠিক করতে পারেন না। পায়চারি করতে করতে পা দুটো ভারী হয়ে ওঠে, দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। বিছানায় এসে বসেন। প্রতিদিন শোবার আগে প্রার্থনা করেন, প্রার্থনা সেরে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েন। ঠিক করলেন, কোন রকমে প্রার্থনা সেরে শুয়ে পড়বেন। কিন্তু প্রতিদিন যে প্রার্থনা করেন, কেমন যেন তার ভাষাগুলো গুলিয়ে যাচ্ছে। কি প্রার্থনা করবেন? সামনে ছোট টেবিলের ওপর তাঁর প্রার্থনার বইটা ছিল। বইটা খুলে যে প্রার্থনা চোখে পড়বে, সেই প্রার্থনাই করবেন। বইটা তুলে নিয়ে আনমনে একটা পাতা খুললেন, পাতার ওপরেই আরম্ভ হচ্ছে একটা প্রার্থনা, প্রার্থনার নাম, Prayer for those at Sea. সমুদ্রে যারা চলেছে তাদের জন্য প্রার্থনা। হঠাৎ সেই প্রার্থনার শিরোনামা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর কথা মনে পড়ে গেল, তিনিও সমুদ্রপথ দিয়েই আসছেন। তবে কি তাঁর

কোন বিপদ হয়েছে? দেড় হাজার মাইল দূরে তাঁর জাহাজ, তাঁর বিপদের সম্ভাবনায় দেহ-মন এত চঞ্চল হবে কেন? যাই হোক, মিসেস্ গ্রেসী নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে বসলেন… প্রতিদিনই তিনি প্রার্থনা করেন, কিন্তু কোনদিন তো কণ্ঠস্বর এমন বাষ্পময় হয়ে ওঠে না, প্রার্থনা করার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস্ গ্রেসীর দু'চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল ঝরে পড়ে। মিসেস্ গ্রেসী প্রার্থনা করেন।

'ঝড় তোমারই সৃষ্টি, সমুদ্রের তরঙ্গ তোমারই খেলা…সেই তরঙ্গে অসহায় তৃণখণ্ডের মত যারা ভেসে যায়, অবলম্বনের কিছু পায় না, একমাত্র তুমি পার তোমার কল্যাণ-হস্ত দিয়ে নিরাপদে তাদের উত্তীর্ণ করতে। হে প্রভু, সেই অবলম্বনহীন তরঙ্গ মৃত্যুর মধ্যে তারা যেন পায় তোমার সেই কল্যাণ-হস্তের স্পর্শ…।'

প্রার্থনা শেষ করে মিসেস্ গ্রেসী আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েন। ঘুমাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। অব্যক্ত অস্বস্তিতে বিছানায় ছটফট করেন। কেন যে এরকম হচ্ছে, কিসের জন্যে হচ্ছে কিছুই ঠিক করতে পারেন না। বিছানা থেকে উঠে পড়েন, আলো জ্বালেন, পায়চারি করেন, আবার আলো নিভিয়ে শুতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না, অস্বস্তি ও যন্ত্রণা কমে না। এইভাবে রাত্রি গভীর হয়ে আসে। দূর থেকে নিস্তব্ধ নিশীথ-বাতাসে ভেসে আসে গির্জার ঘড়ির ঘণ্টার আওয়াজ।

গির্জাটা বহু দিনের পুরানো, তার ঘড়িটা একজন ওস্তাদ কারিগরের তৈরি, প্রত্যেক ঘণ্টার আওয়াজের সঙ্গে তাল রেখে একটা মধুর সুর বেজে উঠতো। মিসেস্ গ্রেসী কান পেতে শুনলেন, রাত দুটো বাজল। সেই দুটোর ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে যে মধুর সুর বেজে উঠলো, তাঁর বেদনাক্রান্ত মন তার প্রত্যেকটি রেশকে অনুসরণ করে চলে। ঘণ্টার আওয়াজ থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিস্মিত হয়ে অনুভব করেন, কে যেন তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে সেই দীর্ঘপ্রহরব্যাপী যন্ত্রণা আর অস্বস্তি নিমেষের মধ্যে মুছে দিল—সেই নিঁদারুণ অস্বস্তিকর চাঞ্চল্য আর অব্যক্ত বেদনার পরিবর্তে তাঁর সর্ব-দেহ-মনে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো এক শান্তস্নিগ্ধ আনন্দ···সেই আনন্দের মাতৃ-স্পর্শে আপনা থেকে তাঁর চোখ ঘুমে বুজে এলো···সুগভীর নিদ্রায় তিনি ডুবে গেলেন।

যখন ঘুম ভাঙলো তখন সকাল হয়ে গিয়েছে···সামনের টেবিলে পরিচারিকা সকালের কাগজ রেখে গিয়েছে। অভ্যাস মত কাগজটা তুলে নিয়ে তার প্রধান সংবাদের হেড লাইনের ওপর চোখ বুলিয়ে নিতে গিয়ে তিনি চমকে উঠলেন, তাঁর সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল...দেখেন, বড় বড় টাইপে লেখা মর্মান্তিক দুঃসংবাদ, যে দুঃসংবাদে সেদিন সারা সভ্য জগৎ উদ্বেল হয়ে উঠেছিল···মহাসমুদ্রের বুকে কাগজের নৌকোর মতন নিঃশেষে তলিয়ে গিয়েছে টাইটানিক জাহাজ···শত শত যাত্রী নিয়ে। মিসেস্ গ্রেসী তাড়াতাড়ি স্বামীর চিঠিটা খুলে দেখলেন, না,

তাঁর ভুল হয় নি, কর্ণেল গ্রেসী চিঠিতে জানিয়েছিলেন তিনি টাইটানিক জাহাজেই ফিরছেন। যাদের বহু কষ্টে সেই সলিল-সমাধি থেকে উদ্ধার করতে পারা গিয়েছে, তাদের একটা প্রাথমিক লিষ্ট্ সেই দুঃসংবাদের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। মিসেস্ গ্রেসী বারবার ক'রে পড়ে দেখলেন, তাতে কর্ণেল গ্রেসীর নাম নেই! তিনি একেবারে ভেঙে পড়লেন।

সেই সময় তাঁর বোন সেই বাড়িতেই ছিলেন। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে তিনি মিসেস্ গ্রেসীকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন, পরবর্তী লিষ্টের জন্য অপেক্ষা করতে বলেন। মিসেস্ গ্রেসী গতরাত্রির বিস্ময়কর যন্ত্রণার অভিজ্ঞতার কথা ভগ্নীকে বললেন। কিন্তু এই বিপদের সঙ্গে যদি তাঁর পূর্ব-রাত্রির মানসিক অভিজ্ঞতার যোগই থাকবে, তবে রাত দুটোর সময় কেন অকস্মাৎ তিনি অনুভব করেছিলেন, সকল যন্ত্রণার অন্তে সেই বিস্ময়কর আনন্দময় প্রশান্তি?

পরের দিনের সংবাদপত্রে উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকদের যে লিষ্ট্ প্রকাশিত হলো, তার মধ্যে কর্ণেল গ্রেসীর নাম দেখা গেল। তিনদিন পরে কর্ণেল গ্রেসী ফিরে এলেন এবং সেই মৃত্যুময় দুর্যোগের বিবরণ প্রসঙ্গে বললেন,—রবিবার, রাত্রি, নিশ্চিন্তে যে যার কেবিনে ঘুমোবার চেষ্টা করছি…এমন সময় হঠাৎ চলন্ত জাহাজটা দুলে উঠলো…বিছানা থেকে পড়ে গেলাম…কানে এলো জাহাজের আর্ত্ত-চিৎকার… হাতের ঘড়িতে চেয়ে দেখি ঠিক দশটা বেজেছে…চারদিকের

আর্তনাদের মধ্যে জানলাম, আমাদের জাহাজ আইস্‌বার্গের সঙ্গে সংঘর্ষে মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে···সুনিশ্চিত মৃত্যু। আপনা থেকেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল তোমার নাম, তোমাকে স্মরণ করে শেষ-বিদায় নিয়ে বললাম, ডারলিঙ, বিদায়! তারপর সেই ভয়াবহ অসহায় মৃত্যু-বিভীষিকার মধ্যে সৈনিকের অভ্যস্ত কর্তব্য-বোধে ক্যাপ্টেনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম···চারদিক দিয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদছে নারী আর শিশুরা ···ধীরে ধীরে একটু একটু করে জাহাজ ডুবছে···যতদূর সম্ভব নারী আর শিশুদের লাইফ-বোটে তুলে দেওয়া হলো···তারপর ক্যাপ্টেনের আদেশে নিমজ্জমান জাহাজের ডেকে সারি বেঁধে দাঁড়ালাম···জল তখন ডেক ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে···তারপর কোন্ মুহূর্তে সমুদ্রের নীল তরঙ্গে ভেসে গিয়েছি জানি না··· সাঁতার দেবার ব্যর্থ চেষ্টায় পরিশ্রান্ত হয়ে যখন মৃত্যুর শেষ নীল আলিঙ্গনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি···তখন যেন বহু দূর থেকে কানে এলো প্রার্থনার সঙ্গীত···কে যেন প্রার্থনা করছে সমুদ্রমগ্নদের জন্যে···এমন সময় একটা ভাঙা তক্তায় হাত লাগল···নিমেষের মধ্যে মনে বাঁচবার নিদারুণ সংকল্প জেগে উঠলো...সেই ভাঙ্গা তক্তা ধরে বহুক্ষণ যুঝলাম···শেষ রাত্রির দিকে একটা লাইফ-বোট এসে আমার অর্ধ-অচৈতন্য দেহ তুলে নিলো···।

বিস্মিত হয়ে মিসেস্ গ্রেসী সেই কাহিনী শোনেন....সেদিন রাত্রিতে তাঁর ঘরে বসে তিনি দেড় হাজার মাইল দূরে তাঁর স্বামীর জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা নিজের অজ্ঞাতে অনুভব

করেছেন, একেবারে ঘণ্টা মিনিট ধরে।

জিজ্ঞাসা করেন, যখন তুমি লাইফ-বোটে ওঠ, তখন ক'টা বেজেছিল বলতে পার?

কর্ণেল গ্রেসী বলেন, উদ্ধার-কর্তাদের রিপোর্ট থেকে জানলাম, তখন ঠিক রাত দুটো। বিস্ময়ে বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে মিসেস্ গ্রেসী বলেন, সারারাত্রি অব্যক্ত যন্ত্রণা ভোগ করার পর ঠিক সেই সময় আমি অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি—এখনও শুনতে পাচ্ছি, নিস্তব্ধ প্রহরে বাজছে গির্জার ঘণ্টা—তার সুরের রেশের সঙ্গে জড়ানো ঘুমের মায়া...।

দেড় হাজার মাইল দূরের ঘটনার সঙ্গে কি করে সম্ভব হলো এই অনুভব-যোগ, ঘণ্টা-মিনিট-সেকেণ্ড ধরে? মানুষের বুদ্ধি আজও পায়নি তার উত্তর।

মিডিয়াম

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের চোখে ভূতের অস্তিত্ব অচল। পাড়াগাঁয়ের ভূতের ভর থেকে প্লাঁসেৎ, মিডিয়ামতত্ত্ব, রাতবিরেতে সম্ভব অসম্ভব ছায়ামূর্তি দেখে চমকে ওঠা—এসব অনেক কিছুই তর্কের উপাদান যোগায়। ভৌতিক অস্তিত্বও ঈশ্বরের মতই নানা মতবাদে বিড়ম্বিত—সেখানে আস্তিক, নাস্তিক, স্কেপ্‌টিক বা অ্যাগ্‌নষ্টিক কারুরই অভাব নেই।

সোজা কথায়, যুক্তির জগতে ভূতের জায়গা নেই। ভূত মানতে গেলে চোখ বেঁধে পিছু হটতে হয় একেবারে প্যালিয়ো-

লিথিক আদিমযুগে। সুতরাং অ-শরীরী তত্ত্বে যারা আস্তিক্য-বাদী, তাদের সঙ্গে আজ আর তর্ক চলবে না—চরম নিষ্পত্তির জন্যে হাতাহাতি করতে হবে।

তবু সব কিছু বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব তর্কের মধ্যেও একটা 'কিন্তু' থেকেই যায়। এমন কতকগুলো প্রশ্ন ওঠে—যাদের উত্তর মেলে না। তার মানে এই নয় যে কোনদিন তাদের উত্তর একেবারেই পাওয়া যাবে না। হয়ত বিজ্ঞানের ব্যাপ্তি একদিন সব কিছুর নিঃশেষ সমাধান করে দেবে। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ কতকগুলো বিচিত্র ঘটনা আমাদের মনকে নানাভাবে আন্দোলিত করতে থাকে।

এই রকম একটা ঘটনা এখানে আমি বলব। এ ভূতের গল্প কিনা জানি না। চোখ কিংবা মনের ভুল কিনা, সে সম্বন্ধেও কোন রায় দিতে আমি প্রস্তুত নই। শুধু যা ঘটেছে, সেইটুকুই বলব। যাঁর যা খুশি, তিনি সেইভাবেই এগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারেন।

প্রায় বারো-তেরো বছর আগেকার কথা। তখন পশ্চিম বাংলার একটা ছোট গ্রাম থেকে আমি শহরে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করতুম। সাইকেলে করে আসতে হত আট মাইল দূরের স্টেশনে। একটা ছোট দোকানে সাইকেল জমা রেখে আমরা ট্রেন ধরতুম, সন্ধ্যের গাড়িতে ফিরে আবার সাইকেল নিয়ে গ্রামে আসতুম।

'আমরা' বললুম এই জন্যে যে ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করতুম-

তুজনে। আমি আর প্রিয়নাথ। মুন্সেফ কোর্টে চাকরী সেরে পাঁচটা নাগাদ প্রিয়নাথের সাইকেল রিপেয়ারিং-শপে এসে আমি আড্ডা দিতুম, চা খেতুম। তারপর সাতটায় দোকান বন্ধ করে সাতটা-বাইশের ট্রেন ধরতুম তুজনে। কোনো একজনের বাড়ি ফেরবার খুব বেশি তাগিদ না থাকলে এই-ই ছিল আমাদের দৈনন্দিন প্রোগ্রাম।

স্টেশন থেকে আমাদের গ্রামের প্রায় সীমানা পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল একটা অনুর্বর কাঁকর-মাটির মাঠ—যাকে বলে ব্রহ্মডাঙা। জেলা-বোর্ডের রাস্তাটা ঢেউখেলানো মাঠের ভেতর দিয়ে চড়াই উৎরাইয়ে চলে গেছে—কোথাও কোথাও কুড়ি-বাইশ ফুট পর্যন্ত ওপরে উঠেছে তু-ধারের ঢাল-জমি ছাড়িয়ে। পথের পাশে দেড়-মাইল তু-মাইলের মধ্যে কোনও গ্রাম নেই—শুধু এলোমেলো ফণীমনসা আর আকন্দের ঝোপ ছড়িয়ে আছে।

এককালে মাঠটা ডাকাতির জন্যে বিখ্যাত ছিল। ওসব উপদ্রব আর শোনা যায় না। কিন্তু তবুও একা এপথে ফিরতে সন্ধ্যের পরে গা ছমছম করত। তু-একটা ভূতের কাহিনীও যে মাঝে মাঝে কানে আসত না এমন নয়। কিন্তু ও ভয়টা কোনদিন আমাদের মনে যে এতটুকু ছাপ ফেলেছে, তা নয়। অন্তত সচেতনভাবে তো নয়ই।

সেদিন কোর্ট থেকে বেরিয়ে কতকগুলো সরকারী কাজ সেরে নিতে আমার রাত হয়ে গেল। প্রিয়নাথের দোকানে আসতেই তার ছোকরা চাকরটা জানালে যে আমার জন্যে

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে যথানিয়মে সাতটা-বাইশের ট্রেনই ধরেছে প্রিয়নাথ।

আমার মনটা দমে গেল। শুধু একা ফিরতে হবে বলেই নয়। দিনটাও দুর্যোগের। একটু আগেই মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে—সেই সঙ্গে আকাশ-চেরা বাজের ডাক। বৃষ্টিটা আপাতত থেমেছে বটে, কিন্তু আকাশ এখনও ঘন-মেঘে একটা আল্‌কাতরার আস্তর দিয়ে মোড়া। যে কোন সময় ঝমঝম করে নেমে পড়তে পারে। এরই মধ্যে রাত ন'টার পরে ওই সীমাহীন কালো মাঠটার ভেতর দিয়ে একা আট-মাইল সাইকেলে করে আমায় ফিরতে হবে। কারণ, সন্ধ্যের পরে স্বভাবতই নির্জন পথটাতে এই বৃষ্টি-বাদলের রাতে যে কোন সহযাত্রী মিলবে এ আশা করাই বিড়ম্বনা।

কিন্তু উপায় নেই, আমাকে যেতেই হবে। ঘন কালো মেঘের দিকে তাকিয়ে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম, তারপর স্টেশনে এসে আটটা আটাশের গাড়ি ধরলুম।

ট্রেন ছাড়তে না ছাড়তেই বৃষ্টি নামল। এমন প্রবল বৃষ্টি সচরাচর দেখা যায় না। সারা আকাশটা যেন গলে গলে ঝরে পড়ছে—অন্ধকার সাদা হয়ে গেছে বৃষ্টির কুয়াশায়। মনের মধ্যে দুশ্চিন্তাটা আরও থিতিয়ে বসতে লাগল। উঁচু কাঁকরের রাস্তায় জল দাঁড়াবে না, কিন্তু মাঠের ভেতর বৃষ্টির সঙ্গে হাওয়া মিশলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে—সেটা অনুমান করা শক্ত নয়।

বৃষ্টি অবশ্য বেশিক্ষণ রইল না। আধঘণ্টার মধ্যে আমি স্টেশনে এসে নামতেই দেখি বৃষ্টিও ধরে গেছে। মেঘ হাল্‌কা হয়ে গেছে—শুধু অল্প অল্প ইল্‌শেগুঁড়ি পড়ছে তির্‌ তির্‌ করে।

যে মুদিখানায় সাইকেল জমা থাকে, সে লোকটা ঝাঁপ বন্ধ করবার উপক্রম করছিল। আমাকে দেখে হাই তুললে। হেসে বললে, 'এই রাতে ফিরবেন? থেকে যান না আমার দোকানে।'

বললুম, 'সে হয়না, বাড়িতে সবাই দুশ্চিন্তা করবে।' আর একটা কথা অবশ্য বলা গেল না—সে তাগিদটাই প্রবলতর। অর্থাৎ মাসখানেক আগে আমি বিয়ে করেছি এবং মাত্র তিন দিন আগে স্ত্রী এসেছে বাপের বাড়ি থেকে।

দোকানদার সাইকেলটা বের করে দিলে। জিজ্ঞেস করলুম, 'প্রিয়নাথ চলে গেছে?'

—'হ্যাঁ, উনি তো সাতটা পঞ্চান্নর গাড়িতেই নামলেন। তখন ভেঙে বৃষ্টি আসছিল—বাজ চমকাচ্ছিল ঘন ঘন। ওঁকেও দাঁড়িয়ে যেতে বলেছিলুম, রাজী হলেন না। বললেন, বোঁ বোঁ করে চলে যাবেন।'

বোঁ বোঁ করে চলে যাব—আমিও ভাবলুম। তারপর সেই ঘন-কালো অন্ধকারে তিরতিরে বৃষ্টির ভেতরেই সাইকেল নিয়ে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়লুম।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই মাঠের রাস্তা এসে পড়ল। দু-ধারের নিবিড়-কৃষ্ণতার ভেতরে ব্যাঙের ডাক, ঝিঁঝিঁর

আওয়াজ আর ছোটো-বড়ো নালায় বর্ষার জলের কলধ্বনি। ল্যাম্পের ছোট আলোটিতে সামনের পাঁচ-সাত হাত দূর পর্যন্ত বাঁকুড়ার রাঙামাটি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সেটুকুও আর রইল না। ল্যাম্পে তেল ছিল না—খেয়াল করি নি। ক্ষীণ হতে হতে দপ করে নিবে গেল সেটা।

এইবার আমার ভয় করতে লাগল। চেনা রাস্তা—যতই অন্ধকার থাক, ঠিক নির্ভুলভাবেই চলে যাব। তবু—তবু এই অন্ধকার, এই নির্জনতা! একবার যদি অসাবধান হই, তাহলে সাইকেল নিয়ে একেবারে দশ-বারো হাত নিচে গড়িয়ে পড়ব।

ছু-চোখকে যতদূর সম্ভব তীব্র করে আমি সাইকেল চালাতে লাগলুম। তাড়াতাড়ি যেতে ভরসা হচ্ছে না, তবু উত্তেজনায় আপনা থেকেই দ্রুতবেগে পা ঘুরছিল প্যাডেলে। সেকেলে বি-এস-এ বাইক—আমার মনের শাসন না মেনেই সে যেন শোঁ শোঁ করে উড়ে চলল।

—'থামো হে সেন, থামো!'

অন্ধকার ছিঁড়ে যেন তীরের মত স্বর উঠল একটা। প্যাডেলে আচমকা পা থেমে এল আমার। পেছন থেকে পরিষ্কার গলায় ডাকল প্রিয়নাথ: 'অত তাড়া কিসের হে? আমি যে সেই এক-ঘণ্টা ধরে মাঠের ভেতর তোমার জন্যে হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে আছি!'

বিস্ময়ে এবং আনন্দে আমি সাইকেল থেকে নেমে এলুম। অন্ধকারেও দেখা গেল পেছন থেকে প্রিয়নাথ দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

—'ব্যাপার কিহে? সেই সাতটা পঞ্চান্নর ট্রেনে নেমে এতক্ষণ মাঠের ভেতরে কি করছিলে?'

প্রিয়নাথ বললে, 'সে অনেক কথা। ভারী মজার ব্যাপার হয়েছে একটা!'

—'এই বর্ষার রাতে মাঠের ভেতরে কি এমন মজার ব্যাপার হতে পারে? আর তোমার সাইকেলই বা গেল কোথায়?'

অন্ধকারে প্রিয়নাথ এবার অল্প একটু শব্দ করে হেসে উঠল। বলল, 'বলছি তো, সে অনেক কথা। গ্রামে ফিরে শুনবে। আপাতত তোমার ক্যারিয়ারে আমায় তুলে নাও।'

—'বেশ, উঠে পড় চটপট।'

প্রিয়নাথ কাছে এল: 'দেখেছ কাণ্ড! জলে-কাদায় একেবারে মাখামাখি হয়ে গেছি। হাড়ের ভেতরটা শুদ্ধু কাঁপছে ঠক্‌ঠক্ করে।'

—'পড়ে গিয়েছিলে নাকি?'

—'হুঁ! সে আর বল কেন! আছাড় বলে আছাড়। একেবারে অতল-জলের ভেতর। কাদার মধ্যে প্রায় বসে গিয়েছিলুম। যাক, বাড়ি ফিরেই শুনবে সে সব কথা।'

আমি সাইকেলের প্যাডেল ঘোরালুম—তড়াক করে

প্রিয়নাথ পেছনে উঠে বসল। একটা ঝাঁকুনি লাগল, টের পেলুম, সীটের আংটাটা প্রিয়নাথ আঁকড়ে ধরেছে।

এই ভিজে রাস্তায়, এমন অন্ধকারে আর একটা মানুষকে ক্যারিয়ারে তুলে নেওয়া যে কি দুর্ভোগ সে বলে বোঝাতে হবে না। কিন্তু অনুভব করলুম—হঠাৎ যেন আমার গায়ে দ্বিগুণ শক্তি বেড়ে গেছে। প্রিয়নাথের অতখানি ওজন আমাকে বিন্দুমাত্র কাবু করতে পারল না। সেকেলে মজবুত বি-এস-এ সাইকেল শন্ শন্ করে চলতে লাগল। এমন কি, অন্ধকারের সম্ভাব্য বিপদটাও যেন কখন নিঃশেষে মুছে গেল মন থেকে।

প্রিয়নাথ কোন কথা বলছে না—আমিও না। নিঃশব্দে প্রায় পনেরো মিনিট চলবার পর হঠাৎ দূর থেকে জলের একটা উগ্র গর্জন শোনা গেল। আমি চমকে বললুম, 'ওকি—খোয়াইতে বান এল নাকি ?'

এইবারে বিচিত্র ব্যাপার ঘটল একটা। প্রিয়নাথ আমার কথায় জবাব দিলে। কিন্তু পেছনের ক্যারিয়ার থেকে নয়। পরম বিস্ময়ে দেখলুম, আমার সাইকেল থেকে প্রায় পনেরো হাত সম্মুখে দু-হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথ। হ্যাঁ, অন্ধকারেও দেখতে পেলুম, প্রিয়নাথই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রিয়নাথ ডেকে বলল, 'নামো সেন, নামো। বানের জলে খোয়াইয়ের পচা কাঠের পুলটা ভেসে গেছে। আর এগোলে খাড়া ত্রিশ-হাত নিচে আছড়ে পড়বে।'

মুহূর্তের মধ্যে সারা শরীরে আমার বিদ্যুৎ বয়ে গেল।

কখন ক্যারিয়ার থেকে নামল প্রিয়নাথ, কখনই বা এমন করে পনেরো হাত দৌড়ে গেল সে !! সাইকেলের গতি মন্দা করতে করতে আবার শুনলুম, 'এখনও নামো সেন, এখনও নামো। নইলে আমার যা হয়েছে, সে দশা তোমারও হবে।'

ক'সেকেণ্ডের মধ্যে সবটা ঘটল জানি না। দেখলুম, প্রিয়নাথের চোখ-দুটো জ্বলে উঠল। তারপর যেন করোটির কোটর ছেড়ে সে-দুটো চোখ তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল আলোর মত উড়ে আসতে লাগল আমার দিকে! যেন ফস্‌ফরাসের দুটো অতিকায় পতঙ্গ!

পরদিন সকালে আমাকে পাওয়া গেল রাস্তার ওপরে, সাইকেলটাকে জড়িয়ে ধরে আমি পড়ে ছিলুম। আর প্রিয়নাথকে পাওয়া গেল ভাঙা পুল থেকে তেইশ-চব্বিশ হাত নিচে, আরও তিন-চার ফুট জলকাদার তলায়। ওপর দিকে পা-দুটো তুলে তার পেট পর্যন্ত প্রায় কাদার মধ্যে গাঁথা—ভাঙা সাইকেলটা খানিক দূরে একখানা বড় পাথরের ওপরে ঝুলে রয়েছে।

ষষ্ঠ ব্যক্তির রহস্য

অমরেশ গুহরায়

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভূত আর ভগবান দুই-ই সমপর্যায়ে পড়ে! একথা এখনও যেমন বুঝি তখনও তেমনি সহজবোধ্য ছিল, কিন্তু তবু হঠাৎ যে কেমন করে অঘটনটা ঘটল সেটা আজও বুঝে উঠতে পারি নি। তাই আজকেও একলা ঘরে সেদিনের কথাটা মনে পড়লে নিতান্ত অকারণে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

সেটা ১৯২৯ কি ৩০ সন হবে। আমরা তখন অনুশীলন দলের সভ্য। বোমা-বন্দুক আর বৈপ্লবিক ভাবধারা নিয়ে

কারবার। আর ভূতের গল্প উঠলে, ভূত এবং বক্তা উভয়কেই বিদ্রূপ করি! পরে হিজলী জেলে আমরা ক'জন বিপ্লবী মিলে ভূত-কমিটি গড়েছিলাম, সেখানে আমরা দশ বারো জন ভূত ছিলাম, অর্থাৎ আমরা যা কিছু করি না কেন কারও আমাদের দেখতে পাওয়া চলবে না। কারও খাবার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে আমরা সরবে প্রতিবাদ করতাম, বা রে—আমরা তো ভূত, তোমরা তো আমাদের দেখতেই পাচ্ছ না! সেই ভূতকমিটির বিধান ছিল যে, প্রতি অমাবস্যার দিনে ভূতের সত্যি গল্প বলতে হবে পালা করে এক এক রাত্রে এবং প্রতি ক্ষেত্রে ভূতের জেতা চাই। আরও মজা হচ্ছে এই যে, সেই ভূত কমিটির অন্যতম পাণ্ডা আমিই এক দিন ভূতের ভয় পেয়েছিলাম!

তখন আমরা থাকতুম ময়মনসিংহ সহর থেকে কয়েক মাইল দূরে এক গ্রামে এক বিপ্লবের আস্তানায়। ওখান থেকে দলের কাজকর্ম করি। কদিন আগে একটা স্বদেশী ডাকাতি করতে গিয়ে আহত হয়ে ফিরে আসেন অন্যতম বিপ্লবী-কর্মী শান্তিদা! সেদিন রাতে তিনি মারা গেছেন! আমরা পাঁচজন তৈরি হলাম শব সংকারের জন্যে; আমি, অবিনাশদা, বিষ্ণু, হরিপদ এবং আর দু'জন। রাতারাতিই দাহ করে ফেলতে হবে শব। দিনের আলোয় অনেক রকমের বিপদ আছে, পুলিশী হুজ্জতের ভয় আছে প্রচুর।

আমি লণ্ঠন হাতে নিয়ে চলেছি আর বাকী চারজন চলেছেন

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না

মৃতদেহ নিয়ে।

শ্মশান প্রায় মাইল চারেক দূর হবে ওখান থেকে। গ্রামটির পরেই বিস্তীর্ণ মাঠ আর তার পরে শ্মশান।

মনটা কেমন ঝিমিয়ে রয়েছে সকলেরই। কত দুঃসাহসিক অভিযানের সহযাত্রীর শব বয়ে নিয়ে চলেছি তার অন্ত্যেষ্টির জন্যে, মন স্বভাবতই কিছুটা আচ্ছন্ন। বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শান্তিদার কথাই মনে পড়ছে। এই সব চিন্তা থেকে মন ফেরাবার জন্যে বিড়ি ধরানো দরকার। অথচ অবিনাশদা রয়েছেন সঙ্গে। অতএব একটু পিছিয়ে পড়লাম ইচ্ছা করেই। সবে ধরিয়েছি বিড়িটা এমন সময় নিতান্ত আকস্মিকভাবে ডাক দিলেন অবিনাশদা, অমরেশ, পিছিয়ে পড়িস নে। মাঝে মাঝে আয়। ভয় পেতে পারিস! হাসি পেল। স্বপ্ন দেখা আর ভূত দেখা দুই-ই সমান; কেউ দেখে না, আসলে চিন্তা। কিন্তু তবু যেন কেমন মনে হতে লাগল। এক সময় মনে হল, পেছনে যেন আর একজন কে চলেছে আমাদের সঙ্গে এবং কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে গাটা ছমছম্ করতে লাগল। কাউকে বলতে লজ্জা হয় অথচ কেমন যেন ভয় ভয় ভাব! মনে সাহস আনার জন্যে পিছন ফিরে দেখে নিলাম ভাল করে, ধ্যেৎ কিছু না ওসব, নিছক মনের ভুল! তবু চিন্তাটা গেল না মন থেকে। অদৃশ্য আর একজন কে যেন চলেছে ঠিক আমার পেছনে পেছনে। এগিয়ে গেলাম দলের মধ্যে। অবিনাশদা টিপ্পনী কাটলেন, কিরে ভয় পেয়েছিস তো, আগেই বলেছিলাম না।

কোন উত্তর করতে পারলাম না।

শ্মশান থেকে মাইল খানেক দূরে থাকে শ্মশানের জিম্মাদার। সেখানে মড়া নামিয়ে চুল্লীর উপযোগী কাঠ-কুটা কিনে নেওয়া গেল। কিন্তু অত কাঠ বইবে কে? মতলব করে কাঠগুলোকে চাপান হল মড়ার ওপরে।

চুল্লীতে মড়া সাজিয়ে আগুন দিয়ে আমরা একটু দূরে বসলাম জটলা পাকিয়ে। আশ্চর্যের বিষয়, অমন আসর-জমানো লোক অবিনাশদাও ঠিকমত গল্প জমাতে পারলেন না অনেক চেষ্টা করে। সকলের মনেই কি যেন একটা চিন্তা রয়েছে। অবশেষে শেষ চেষ্টা করলেন অবিনাশদা, আইচ্ছা, অখন কার মনে কি ভাব জাগছে ক দেখি সকলে সত্য কইর‍্যা—

হরিপদ বয়সে সকলের ছোট দলের মধ্যে। সে কাঁদ কাঁদ স্বরে বললে, আমার দাদা কেবলই মনে হইতাছে, আমাগো সাথে কে য্যান্ এক ষষ্ঠ ব্যক্তি রইছে!

আমরা সকলে, এমন কি অবিনাশদা অবধি স্বীকার করলেন আমরাও সেই রকমই অনুভব করছি! বুঝছি ভয়, তবু মনে হচ্ছে, ষষ্ঠ আর একজনও রয়েছে আমাদের মধ্যে। সে কথা মনে হলে আজও গায়ে কাঁটা দেয়!

চুল্লী ধরানোর পর আধ ঘণ্টাও হয়নি, ছোট খাটো এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। চুল্লীটা নিভে গেল ভিজে গিয়ে। অথচ কাঠ আনতে যেতে হবে সেই এক মাইল দূরে। কেউ যেতে রাজী নয়, তার ওপর লণ্ঠনও একটা। অতএব ভেবে

চিন্তে স্থির করা গেল সকলে এক সঙ্গে যাওয়া যাক। মড়া সেইভাবে রইল আধপোড়া হয়ে, আমরা কাঠ আনতে চললাম।

দীর্ঘ এক মাইল পথ চলা সহজসাধ্য নয় ওই রকম মনের অবস্থায়। তার ওপর ঝাড়া এক ঘণ্টা গলা-ফাটানো চিৎকার ও সজোরে দরজা ধাক্কার পর জানালার কপাট খুললেন শ্মশানের ইজারাদার ভদ্রলোক।

আলো উঁচু করে হাঁকলেন, কে—?

উত্তর দিলাম, আমরা, জলে আমাগো চুল্লী নিভা গেছে। কিছু শুকনা কাঠ দরকার, তাই ডাকি!

সন্তর্পণে দরজা খুললেন ভদ্রলোক। আমরা ঘরে ঢুকে মেঝেয় পাতা চৌকিতে বসতেই তিনি আবার দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

একি, দরজা বন্ধ করেন ক্যান? কাঁপতাছেন ক্যান আপনে? প্রশ্ন করলেন অবিনাশদা।

কাঁপা গলায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা উত্তর এলো, ছ্যাখেন, প্যাটের দায়ে এই তেপান্তরের মাঝে পইড়া আছি, স্ত্রী পুত্র লয়্যা বাস করছি কিন্তু ভয় পাই নাই কোন দিনও। আইজ আপনারা আসার কিছু আগে একজন আইস্যা কয়বার দরজায় ধাক্কা দিল, জানলা খুইল্যা 'কি চাই' জিগাইতে, কইল, সে আপনাদের দলের লোক; বৃষ্টিতে চুল্লী নিভ্যা যাওনে কাঠ লইতে আসছে। ও মশায়—দরজা খুইল্যা দেখি কোথাও কেউ নাই, কি কমু কত্তা এমন ভয় আমি কোন কালেও পাই নাই—। ইজারাদার

কাঁপতে লাগলো। আমাদেরও মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। অথচ উপায় ছিল না। সে রাত্রেই আবার কাঠ নিয়ে এসে চুল্লী ধরাতে হয়েছিল। কিন্তু আজকেও সে বিস্ময় আমার ঘোচেনি, কে ছিল এই ষষ্ঠ ব্যক্তি ! আমাদের সকলের মধ্যেই কি সংক্রামিত হয়েছিল ভয়, না, সত্যি কোন অশরীরী ষষ্ঠ ব্যক্তি এসেছিল !

অবাঞ্ছিত উপদ্রব

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ সাহেব ছিলেন বিখ্যাত সরোদবাদক। তিনি জীবনের শেষ কয়েকটা বছর এই কলকাতা শহরেই কাটিয়েছিলেন। সে সময় শহরের ধনী-নির্ধন অনেকেই তাঁর সাকরেদ হোয়ে বাজনা শিখতেন। খাঁ সাহেব শুধু উঁচু দরের বাজিয়ে ছিলেন না, তিনি একজন উঁচু দরের মজলিশী লোকও ছিলেন। তাঁর গল্প এক সময়ে শহরে প্রবাদের মত রাষ্ট্র ছিল। পরলোকগত স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী লেডী প্রতিমা চৌধুরাণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সঙ্গীত সঙ্ঘের' অধ্যক্ষ

ছিলেন করমতুল্লা খাঁ সাহেব।

আগেই বলেছি, ওস্তাদজী খুবই মজলিশী লোক ছিলেন। তার ফলে আমরা তাঁর জন-কতক শিষ্য সেই ভোর থেকে আরম্ভ করে বেলা নটা সাড়ে-নটা অবধি আর রাত্রি নটা থেকে সেই বারোটা-একটা অবধি সেখানে আডডা জমাতুম। দেশ-বিদেশের আরও অনেক নামজাদা বাজিয়ে-গাইয়ে আসতেন সেখানে— গান-বাজনার জলসা যে দিন হোতো সেদিন আর আড্ডা ভাঙবার সময়ের ঠিক থাকত না, সন্ধ্যে থেকে ভোর হোয়ে যাওয়াও এমন কিছু বড় ব্যাপার ছিল না।

গ্রীষ্মের ও পূজার সময় সঙ্ঘের লম্বা ছুটি থাকত এবং সে সময় খাঁ সাহেব নিজের দেশে যেতেন। তাঁর বাড়ির মহিলারা কেউ এখানে থাকতেন না। তাঁদের দেখা-শোনা করবার জন্য বছরে অন্তত এই ছ'বার দেশে না গেলে তাঁর চলত না। তিনি থাকতেন ভাড়াটে-বাড়িতে এবং প্রতিবারই দেশে যাবার সময় বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যেতেন এবং ফিরে এসে আবার বাড়ি ভাড়া ক'রে সেখানে গিয়ে উঠতেন। যতদিন না বাড়ি পাওয়া যেত ততদিন হয় মধু রায়ের লেনে কালী পালের বাড়ি বা কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটে গজেন ঘোষের বাড়িতে থাকতেন আর আমরা সবাই ছুটোছুটি করতুম বাড়ির তল্লাসে।

খাঁ সাহেবের পছন্দমত বাড়ি চাই। খোলা-মেলা আলো-হাওয়া পাওয়া যায় এমন বাড়ি হোলে তাঁর চলবে না। চার-দিক বেশ বন্ধ থাকবে, অন্য কোনো বাড়ি থেকে কিছু দেখা যাবে

না, অর্থাৎ, তাঁর ভাষায় বাড়িখানি একেবারে 'সিন্দুকে'র মত হওয়া চাই। এখনকার লোকেরা হয়ত বিশ্বাস করতেই চাইবেন না, কিন্তু সেকালে সব সময়ে সব রকমের বাড়িই ভাড়া পাওয়া যেত।

এই রকম একটা সময়ে খাঁ সাহেব দেশ থেকে ফিরে এসেছেন, শিষ্য-সম্প্রদায় বাড়ির খোঁজে ব্যস্ত, কিন্তু সেবার আর মনের মত বাড়ি জুটছে না। শেষকালে বেশ কিছুকাল খোঁজা-খুঁজির পর একখানা বাড়ি পাওয়া গেল। বাড়িখানা মানিকতলা স্ট্রীটে ছাতুবাবুর বাজার ছাড়িয়ে গিয়ে যে কালীমন্দির আছে তার একটু আগে একটা গলির মধ্যে। তখন কলকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ তৈরি করছেন। এই বাড়িখানাও রাস্তায় পড়েছিল—বাড়িখানার সামনে-পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে সব ভাড়া বাড়ি। কোনটা একেবারে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, কোনটা আস্তে আস্তে ভাঙ্গা হচ্ছে। মাস পাঁচ ছয় বাদে এখানাও ভাঙ্গা হবে। অন্তত মাস পাঁচ-ছয়ও থাকা যাবে এই মনে ক'রে খাঁ সাহেব বাড়িটা পছন্দ করলেন এবং দিন-দুয়েকের মধ্যেই জিনিসপত্র এনে এখানে উঠলেন।

আমরা আগের মতন সকাল-সন্ধ্যায় সেখানে জুটতে লাগলুম। রাত্রে অনেকখানি অন্ধকার গলি পার হোয়ে তবে বাড়িতে ঢুকতে হোত। এইখানে গ্যাস কিম্বা অন্য কোনো আলো জ্বলত না। তার ওপরে দু-পাশে সব ভাঙ্গা বাড়ি থাকায় গলি পার হবার সময় অনেকেরই গা ছম-ছম করত।

একদিন, তখন রাত্রি প্রায় আটটা হবে, খাঁ সাহেবের একটি শিষ্য ঐ গলিটা পার হচ্ছেন এমন সময় ভদ্রলোকের কানের পাশ দিয়ে একটি বড় ডাব বেরিয়ে গিয়ে সামনে পড়ল। আমরা অনেকেই তখন ওপরে বসেছিলুম। ভদ্রলোকটি আমাদের একথা বলবামাত্র আমরা আলো ও লোকজন নিয়ে নিচে গেলুম। দেখলুম ডাবটা তখনো পড়ে রয়েছে—সেটি মাথায় লাগলে তাঁকে আর উঠতে হোতো না। নিশ্চয় কোনো বদমাইস লোকের কাজ মনে করে তো তখনকার মতন আমরা চলে গেলুম।

পরের দিন সকালে এসে শুনলুম যে কাল সারারাত্রি মহা হাঙ্গামা গিয়েছে। কি ব্যাপার! শোনা গেল, রাত্রি এগারটার সময় স্নানের ঘরে কল খোলার শব্দ পেয়ে নিচে গিয়ে কল বন্ধ ক'রে আসা হয়। সে সময় কলকাতা শহরের অনেক জায়গায় সারা রাত কলে জল থাকৃত। যা হোক ওপরে আসবার পরই আবার জল পড়ার শব্দ শুনতে পাওয়া যায় এবং আবার তারা নিচে গিয়ে বন্ধ ক'রে আসে। এই রকম বার কয়েক হোতেই তারা দু-তিনজন মিলে নিচে গিয়ে কল বন্ধ ক'রে স্নানের ঘরের সামনেই বসে থাকে, কিন্তু একটুক্ষণ পরেই আবার কে কল খুলে দিতেই ভয়ে তারা ওপরে উঠে আসে এবং সারারাত্রি ধরে জল পড়েছে।

দোতলায় একটা বড় হলঘর ছিল। এই ঘরে খাঁ সাহেব থাকতেন, তা ছাড়া বাজনার আসর ইত্যাদি এই ঘরেই করবার

বন্দোবস্ত হোতো। সেদিন রাত্রে এই ঘরে আমরা বসে কাল রাত্রের সেই কল খোলা ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা করছি এমন সময় ওপর থেকে ঝুপ ঝুপ ক'রে পুষ্পবৃষ্টির মতন আমাদের মাথার ওপরে খানিকটা আঁস্তাকুড়ের ময়লা পড়ল। আমরা তো অবাক! এ-রকম চাষাড়ে রসিকতার চলন সেখানে ছিল না, কাজেই উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে এ-কাজ কেউ করেনি। যা হোক সে জায়গাটা পরিষ্কার করে আবার বসা গেল, কিন্তু বসতে না বসতেই আবার সেই ময়লার বৃষ্টি—যত সব তরকারির খোসা!

ব্যাপার দেখে খাঁ সাহেব তো নানারকম মন্ত্র-তন্ত্র আওড়াতে লাগলেন। ঝাড়-ফুঁক চলতে লাগল। সেদিনকার মত আমরা সরে পড়লুম। পরের দিন এসে শুনি সারারাত সেই রকম কল খোলা চলেছে এবং রাত্রে আরও দু-একবার ময়লাও পড়েছে। খাঁ সাহেবের দেশের বাড়িতে অনেকগুলি ছেলে মানুষ হচ্ছিল, এবারে তাদের মধ্যে দু-একজনকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন। এদের মধ্যে একজন বললে—সিঁড়িতে একজন দাড়িওয়ালা অপরিচিত বৃদ্ধ দাঁড়িয়েছিলেন, আমি কাছে যেতেই তিনি যে কোথায় মিলিয়ে গেলেন তা বুঝতে পারলুম না।

এ ছোকরা ছিল খুবই ওস্তাদ। সমস্ত ব্যাপারটার ওপর একটু রং দেবার জন্যই কথাটা সে বানিয়ে বলেছিল। কিন্তু যাই হোক শূন্য থেকে আমাদের ওপরে ময়লা পড়া সমানে চলতে লাগল। ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিয়ে ওপর দিকে চেয়ে

থেকে বসে দেখছি হঠাৎ শূন্য থেকে খানিকটা ময়লা ঝুর ঝুর ক'রে পড়ল—ফাঁকা জায়গায় নয়, লোকের ওপরে। এদিকে খাঁ সাহেব পাঁচ ওক্ত নেমাজ পড়তে লাগলেন, বাড়িতে কোনো প্রকার অনাচার যাতে না হয় সেদিকে কড়া নজর রাখলেন। ঘরের মধ্যে সর্বক্ষণ গুগ্‌গুল জ্বলতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না—সন্ধ্যের পর লোকজন আসরে বসলেই ময়লা পড়া সমানে চলতে লাগল।

ব্যাপার দেখে আড্ডাধারীরা সরে পড়তে আরম্ভ করলে। অনেক বাইরের লোকও কৌতূহলপরবশ হোয়ে আসতে লাগল। আমাদের অমন শান্তির নীড় বাজারের হট্টগোলে পরিপূর্ণ হোলো। খাঁ সাহেবের এক বন্ধু ছিলেন, তাঁর কাবুলে বাড়ি। সকলে তাঁকে সৈয়দ সাহেব বলে ডাকতেন। ভদ্রলোক উর্দু বলতে পারতেন না, ফার্শিতে কথা বলতেন, কিন্তু উর্দু বুঝতে পারতেন। খাঁ সাহেবও ফার্শি বলতে পারতেন না, তবে বুঝতে পারতেন। এই সৈয়দ সাহেব ধার্মিক লোক ছিলেন আর ঝাড়-ফুঁক ও তন্ত্র-মন্ত্রেও ছিলেন ওস্তাদ। হালে পানি না পেয়ে এই সৈয়দ সাহেবের শরণাগত হওয়া গেল শেষকালে। সৈয়দ সাহেব এসে সব শুনে কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়ে থেকে বললেন—কোনো ভয় নেই। এ হচ্ছে একরকম বদমাইস ভূতের 'কাজ। দাঁড়াও ঠাণ্ডা ক'রে দিচ্ছি।

সৈয়দ সাহেব আট-দশটা কাগজে কি সব মন্ত্র লিখে দেওয়ালের জায়গায় জায়গায় মেরে দিলেন। ঘরে খুব গুগ্‌গুল

জ্বালানো হোলো। তিনি নেমাজ ও সেই সঙ্গে আরও কি কি সব পড়ে বলে গেলেন—ব্যস্! ভূত ঠাণ্ডা হোয়ে গেছে। দু'দিন পরে আমায় খবর দিও। ঠিক হোলো সেদিন সন্ধ্যার পরে ভূতের কল্যাণার্থে বিশেষ জলসা হবে। যারা আড্ডায় আসা বন্ধ করেছিল তাদের কাছে ও আরও অনেকের কাছে বিশেষ নিমন্ত্রণ পাঠানো হোলো।

সেদিন সন্ধ্যাবেলার জলসায় অনেকেই এসে উপস্থিত হলেন। সৈয়দ সাহেব দেওয়ালের যে যে জায়গায় তাগা মেরে দিয়েছিলেন আমরা সেই জায়গাগুলোতে দেওয়ালে গা-সাঁট্টা হোয়ে বসলুম। সন্ধ্যা উৎরে গেল। খাঁ সাহেবরা সকলে নেমাজ সেরে এসে আসরস্থ হলেন। সকলের মুখেই ভূতের গল্প—যার যা অভিজ্ঞতা ও শোনা কথা বলতে লাগলেন। রাত্রি আটটা অবধি কোনো অত্যাচার—ময়লা পড়া অথবা কল খোলা হোলো না দেখে খাঁ সাহেব সাজ মেলাতে আরম্ভ করলেন। সেদিন সঙ্গত করেছিলেন বিখ্যাত তবলা-বাদক দর্শন সিং—আজ তাঁরা উভয়েই প্রেতলোকে।

প্রায় নটা নাগাদ খাঁ সাহেব বাজনা শুরু করলেন। বেশ জমিয়ে দরবারী আলাপ ক'রে গৎ শুরু করেছেন—শ্রোতৃবৃন্দ চারদিক থেকে বাঃ, বহুৎ আচ্ছা প্রভৃতি প্রশংসাসূচক আওয়াজ ছাড়ছেন দেখে অন্তরীক্ষে ভূত মশায় আর সংযম রক্ষা করতে পারলেন না। খাঁ সাহেব ও দর্শন সিং-এর মাথার ওপর বারবার ক'রে খানিকটা পুষ্পবৃষ্টি হ'য়ে গেল—বাদামের খোলা,

পঁ্যাজ ও আলুর খোসা এবং তৎসহ যথোচিত ছাই কাদা ইত্যাদি—একবার নয়, দু'তিনবার। খাঁ সাহেব বাজনা থামিয়ে সরোদটি নামিয়ে রেখে ওপর দিকে চেয়ে বললে—তোবা! তোবা! তারপরে একটু থেমে বললেন—কুছ রূপিয়া পয়সা ফেঁকো বাবা!

ওদিকে ব্যাপার দেখে শ্রোতৃবৃন্দ আস্তে আস্তে হাল্কা হোতে লাগলেন, কিন্তু তাঁরাও বঞ্চিত হলেন না। তাঁদের ওপরেও কয়েকবার পুষ্পবৃষ্টি হোয়ে গেল।

পরের দিন ভোর না হোতে সৈয়দ সাহেবকে ডেকে আনা হোলো। সব শুনে তিনি বললেন—এই হিন্দু পাড়ায় আমি মনে করেছিলুম এ সব হিন্দু ভূতের কাজ, কিন্তু এখন দেখছি তা নয়! কারণ আমি যে মন্ত্র ঝেড়েছি হিন্দু-ভূত তা কিছুতেই সহ্য করতে পারত না। এ হচ্ছে জিন—একেও আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি, তবে কিছুদিন সময় লাগবে।

খাঁ সাহেব কিন্তু আর সময় দিলেন না। তিনি সেইদিনই জিনিসপত্র নিয়ে এক সাকরেদের বাড়ি গিয়ে উঠলেন। শিষ্য সম্প্রদায় আবার ছুটোছুটি শুরু করলে নতুন বাড়ির তল্লাসে।

ভবিষ্যৎবাণী

গৌরী বস্থ

....

আমার বন্ধু গীতার জীবনের কথা মনে হলে আমার যুক্তিবাদী মন কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না। আমার পিত্রালয়ের নিকট প্রতিবেশিনী হওয়ায় তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বটা বেশ পাকা হয়েছিল এবং আজও আছে।

গোড়ার দিকে শ্বশুরবাড়ি এসে গীতার মন কেমন করতো সদা-ব্যস্ত শহরের অতি-পরিচিত পরিবেশের জন্য। মধ্য কলকাতায় সারপেনটাইন লেনে মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছে সে—একটু বড় হয়ে উঠতে মামা দেখে-শুনে বিয়ে দিলেন।

শ্বশুরবাড়ি হলো কলকাতারই উপকণ্ঠে গোবরায়। এই নির্জন নারিকেল গাছ, পুকুর এবং বন্য ফুলে ভরা জায়গাটা শহরের লাগোয়া বলে মনে হতো না। একেবারে পল্লীগ্রাম বলে মনে হতো—ক'বছর আগে গোবরা তো তাই ছিল। দেখতে দেখতে বিবাহিত জীবনের অনেকগুলো বছর কেটে গেছে—এ জায়গাটা আর তার তেমন ভয়ের নয়—ভালবাসার জায়গা হয়েছে। দুটো বাচ্চা মেয়ে এসেছে তার কোলে—পেয়েছে সে তার স্বামীর অফুরন্ত ভালবাসা আর প্রেম। সচ্ছল অবস্থা। শ্বশুরবাড়ির বড় একতলা বাড়িটা ভাগ হয়ে যেটুকু সে পেয়েছে তাঁকে সে প্রাসাদ বলে গর্ব করতো। চমৎকাব কাটছিল দিনগুলো। রসিয়ে রসিয়ে জীবনকে ভোগ করার অধিকার সে পেয়েছে বার বার তার একথাই মনে হতো। স্বামীর লোহার ব্যবসা, কাঁচা টাকা রোজগার। ছাঁপোষা কেরাণীর বউ হতে হয় নি—এও তাব কম গর্ব নয়।

বাড়ির সামনের বাগানটায় একদিন সে ঝাঁট দিচ্ছে। ভোর সকালে উঠে ঝাঁট দেওয়া তার অভ্যাস। পেটে তার আরেকটা বাচ্চা এসেছে। সকাল বেলায় পেটের বাচ্চাটার কথা সে আনমনে মনে করছে—কি নাম হবে, কেমন দেখতে হবে–। ভাবনার লঘু মেঘ তার মনকে অধিকার করে আছে—হঠাৎ একটা আওয়াজে চোখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেলে একজন সন্ন্যাসী তার সামনে দাঁড়িয়ে। সহাস্যবদন, প্রশান্ত দীর্ঘ আকৃতি, —ঘন জটা, গেরুয়া বাস।

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না

: বড় ভাগ্যবতী তুই মা—আনন্দময়ী তুই। সন্ন্যাসী ঠাকুর বললেন। গীতার মনে হল সকালেই রোজগারের ফিকিরে বেরিয়েছে সন্ন্যাসী! অবজ্ঞা সন্দেহ তার মনে আসা যাওয়া করতে লাগলো। সে ঝাঁটাটা হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

: পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম—তোকে দেখতে পেয়ে আনন্দ হলো। কিন্তু মা সামনে তোর বড় বিপদ—

বিপদ! গীতা অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করে উঠলো যেন।

: হ্যাঁ—খুব বিপদ তোর সামনে তাই তোকে সাবধান করতে এলাম। সন্ন্যাসীর প্রশান্ত-গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

: আপনি যখন সাবধান করতে এসেছেন তখন আপনি আমার এই বিপদ কাটিয়ে দিন বাবা…

: তোর বিপদ দূর করা তোর হাতেই রয়েছে।

: আমার হাতে?

: হ্যাঁ—তোর হাতে। খুব বিপদ তোর স্বামীর, আজকে কিছুতেই তোর স্বামীকে বেরুতে দিস না। শুধু আজকের জন্যে তাকে ঘরে আটকে রাখ—তাহলেই তোর বিপদ কেটে যাবে।

সন্ন্যাসী চলে যাবার জন্যে উদ্যোগী হতেই গীতা তাঁকে বাধা দিল। বলল—বেশ, স্বামীকে বেরুতে দেবো না। কিন্তু আপনি আমার একটা প্রতিকার করলেন, তাই একটু দাঁড়ান, আপনাকে টাকা এনে দিচ্ছি।

গীতাও ছাড়বে না সন্ন্যাসীও টাকা নেবেন না এমনি করে

কিছুক্ষণ কাটার পর সন্ন্যাসী মৃদু হেসে শেষে বললেন : আচ্ছা বেশ টাকা নিয়ে আয়—

গীতার মনে তখনও সন্দেহ। মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেছে তার। ভিতরে গিয়ে নিজের ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলতেই পাঁচ টাকার একটা নোট চোখে পড়ল। সেটা হাতে করেই সে দ্রুত পায়ে আবার ঘরের বাইরে এলো। কিন্তু কই, কোথায় সন্ন্যাসী? কেউ কোথাও নেই!

তার শরীরটা যেন কেমন করতে লাগল। ভয়ে ভাবনায় বুকটা দুরু দুরু করতে লাগল। ঘরে এসে সে শুয়ে পড়ল এবং মনে মনে ফন্দী আঁটতে লাগল কি ভাবে তার স্বামীকে আজকের দিনটা একেবারে বন্দী করে রাখবে।

গীতার স্বামী সমরেশ স্ত্রীকে অসময়ে শুয়ে থাকতে দেখে অবাক হলো : কি হলো?

: কি জানি শরীর কেমন করছে, ভয় করছে—তুমি আজ একদম বেরিও না লক্ষ্মীটি! গীতার কাতর মিনতি মাখান কণ্ঠস্বর।

সমরেশ হাসল : বেশ, তোমার কথাই রাখবো। একটু চা করে দাও, আর একটু হালুয়া—খেয়েই একপাক ঘুরে আসি। ষাট হাজার টাকার একটা অর্ডার পাব। দুপুরের ভিতরেই ফিরব। সারাদিন আর বেরুবো না—

: না, একদম তোমার বেরুনো হবে না। গীতার জেদ যেন বেড়ে উঠল।

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না

ঃ মাথা খারাপ—পাগল হলে না কি! ষাট হাজার টাকার অর্ডার—!

রাগ অভিমান চোখের জল কিছু দিয়েই সমরেশকে ধরে রাখা গেল না। গীতাও উঠল না। সকালের চা না খেয়েই সমরেশ সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল—সাইকেলের ঘন্টাটা দূরে মিলিয়ে যেতেই গীতা আবার ঝেড়ে-ঝুড়ে উঠল। শূন্য দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ সে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ঘরকন্নার কাজে মন দিল।

সমরেশ সাধারণতঃ সকালে বেরুলে বেলা একটায় ফেরে। খেয়ে দেয়ে খানিক জিরিয়ে আবার বেরোয়। বিয়ে হওয়া অবধি এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। বারোটার মধ্যে রান্নাবান্না চুকে গেল। বাচ্ছা দুটোকে খাইয়ে সে আবার জানালার ধারে এসে বসল। মনের ভেতর কেমন যেন অস্বস্তি—সন্ন্যাসী গায়ে পড়ে একথা বলল কেন? চেষ্টা করল মন থেকে এই ভাবনাব ভূতকে তাড়িয়ে দিতে। ষাট হাজার টাকার অর্ডারটা পেলেই এই পাড়াগেঁয়ে নির্জন জায়গা ছেড়ে সে কলকাতায় বাড়ি করবে। ক'দিন আগে তার মামা ভোলানাথবাবু সারপেনটাইন লেনে একটা বাড়ির কথা তাকে বলছিলেন বটে। হঠাৎ কি খেয়াল হতে ঘড়ি দেখল, প্রায় দেড়টা বাজে! কি হলো! একটার মধ্যে তো সে ফেরে? এখনও এল না কেন? সকালের রাগটার জের নাকি?—নানান চিন্তায় তার মন দোল খেতে লাগল।

এমনি করে যখন আরও ক'ঘণ্টা কাটল—দুপুর গড়িয়ে বিকেল এল—তখনও সে তার স্বামীর জন্যে হাঁড়িটি আগলে বসে। সাড়ে চারটে নাগাদ সে তার মামা ভোলানাথবাবুকে খবর পাঠালে দারোয়ানের হাতে একটা চিঠি দিয়ে।

ভোলাথবাবু সমরেশের ব্যবসাস্থল জানতেন আগেই, সেখানে দৌড়লেন। সেখানে কোন খোঁজ না পেয়ে সমরেশ যে-সব জায়গায় কখনো ব্যবসার খাতিরে, কখনো আড্ডা দেবার জন্য যায়, সে সব জায়গায় খোঁজ নিতে শুরু করলেন। কিন্তু কোথায় সমরেশ? তারপর মুচিপাড়া থানা, পরে লালবাজারে খোঁজ নিলেন—শুরু হলো বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সহর পরিক্রমা। কলকাতার সমস্ত হাসপাতালগুলো খোঁজ নিলেন, কিন্তু সমরেশের কোন সন্ধান পেলেন না।

শেষে রাত এগারটা নাগাদ খবর এল—মেডিক্যাল কলেজের 'এমারজেন্সি ওয়ার্ডে' দুর্ঘটনার জন্যে একজন আছে যার চেহারার সঙ্গে সমরেশের মিল আছে। ভোলানাথবাবু দৌড়লেন সেই রাত্রে। ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলেন—আছড়ে পড়লেন ডাক্তারের পায়ে, শুধু একবার, শুধু একবার আমাকে দেখতে দিন—দেখি ও আমাদের লোক কিনা! ডাক্তার অটল অনড়ঃ অসম্ভব, রাত্রে কিছুতেই নয়—সকালে আসুন।

সারারাত ভোলানাথবাবুর হাসপাতালের দোরগোড়ায় কেটে গেল। সকালবেলা ডাক্তারবাবু অনুগ্রহ করে অনুমতি

দিলেন। ভোলানাথবাবু আতঙ্কে শিউরে উঠলেন সমরেশের অবস্থা দেখে। অজ্ঞান-অচৈতন্য অবস্থা, য়্যাক্‌সিডেন্টে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল পেটে ঢুকে গেছে!

প্রতীক্ষারত গীতার রাত্রি যে দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে কেটেছে তা বলার নয়। সকালে তার মামা ভোলানাথবাবু হাঁউমাউ করে গিয়ে পড়লেন। গীতা পাথর হয়ে গেল সে খবর পেয়ে। তারপর কেবিন, নার্স, ডাক্তার আর ঔষধপত্রে সর্বস্ব পণ করল গীতা। বারো ঘণ্টার মধ্যে হাজার টাকা খরচ করল।

সন্ধ্যার দিকে সমরেশ চোখ মেলে তাকাল—গীতা ঝুঁকে পড়ল তার মুখের ওপর: ওগো দেখো আমি এসেছি···

: গীতা, দেখেছ, কি চমৎকার বড় বাড়ি করেছি—বলেছিলাম তোমার মনের মত বাড়ি করে দেবো—শূন্য দৃষ্টিতে হাসপাতালের প্রকাণ্ড বড় সাদা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সমরেশ প্রলাপ বকতে শুরু করল।

সেদিন রাত্রেই সব শেষ হয়ে গেল। ষাট হাজার টাকার অর্ডার আনতে যে মানুষ গেল সে আর ফিরল না।

সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎ-বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল, কিন্তু সংসারে এত লোক থাকতে এবং এত লোকের বিপদ থাকতে তাকে সাবধান করতে সন্ন্যাসী এলেন কেন?

তোমার প্রকাশ জীবে জীবে

কালীপদ চট্টোপাধ্যায়

আমার ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী তখন হুগলী জেলার ইলসোবা গ্রামে সপরিবারে থাকতেন ; সেখানকার গুরু ট্রেনিং ইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন তিনি। তাঁর একমাত্র ছেলে শিবপ্রসাদ—এখন সে বেঙ্গল ইম্যুনিটির প্রচার-অধিকারিক—ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল যে, তাকে আর কুইনিনে ধরত না। জায়গাটাও ম্যালেরিয়ার ডিপো একেবারে—প্রসিদ্ধি ছিল, সেখানে ত্রিরাত্র বাস করলে নাকি ম্যালেরিয়া ধরবেই।

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না

১৩৪১ সালের বর্ষাকাল। ইলসোবায় গেলাম দিদির বাড়ি বেড়াতে। গিয়ে দেখি, ভাগনেটি জ্বরে শয্যাগত। ওখানকার ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে শিবু তখন কুমিল্লার কলেজে পড়ে—কলেজ-হোষ্টেলে থাকে ; গরমের ছুটিতে বাসায় এসেছে বেড়াতে। এসেই পড়েছে জ্বরে।

জামাইবাবু দেখলাম দু'পায়ের হাঁটু থেকে গোছ অবধি ন্যাকড়া জড়িয়ে বসে আছেন বিরস মুখে গালে হাত দিয়ে, ন্যাকড়ার পটির নিচে থেকে উঁকি মারছে আকন্দপাতা। বাতের আক্রমণে অচলদশা। আমাকে দেখে বললেন, 'বাঁচলাম তুমি এসেছ।'

শিবুকে তো আর কুইনিনে ধরে না। একটা কবরেজি পাঁচনের নাম করলেন—একটা জেলার নামে তার নাম। আমি তার নাম করলাম না—বিনা লাভে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে যাবে তাতে। এক জেলার সেই পাচন পাওয়া যায় অন্য জেলায়—বর্ধমানে। সেই পাচন সেবন করলে নাকি শ্রীমানের জ্বর ছাড়ে। সেদিন আর সময় নেই, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, পরদিন সকালের ট্রেনেই আমাকে বর্ধমান গিয়ে সেই কুইনিন-বিজয়ী ম্যালেরিয়ারি নিয়ে আসতে হবে।

পরদিন সকালে খন্তান ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরলাম। যথাসময়ে গিয়ে নামলাম বর্ধমানে। সহরে ঢুকে কবরেজ মশাই-এর দোকান খুঁজে বের করলাম। কবরেজ মশাই সজ্জন ব্যক্তি, সপরিবারে বাস করেন সেখানে। তাঁর আতিথেয়তায় স্নান

করলাম। নিজে যেখানে খান সেখানে সঙ্গে করে নিয়ে নিজের খরচেই আহার করালেন।

তাঁর আয়ুর্বেদালয়ে ফিরে গেলাম আবার। বিশ্রাম করার অনুরোধ জানিয়ে বললেন যে, ওষুধটা প্যাক করা নেই। ছ' বোতল কেনবার জন্য গিয়েছি ; কেননা দিদির বাসায় ভাগনী-গুলোও তো ম্যালেরিয়ায় ভোগে যখন-তখন, আর শিবুও এক বোতল খেয়ে, ছ'বোতল নিয়ে যাবে কুমিল্লায়, দীর্ঘদিন সেবনে যদি দুরন্ত রোগের জড়টা মরে। ছ'টা বোতলে ওষুধ পুরে লেবেল-ফেবেল আঁটতে সময় লাগবে খানিকক্ষণ। তা ছাড়া ফেরবার গাড়িও তো সেই বিকেলে।

কিন্তু আহারের পরে গড়াগড়ি দেবার ধাত ধরেনি তখনও। বললাম, 'তার চেয়ে, কাছাকাছির মধ্যে অল্প সময়ে দেখে আসার মত কি আছে বলুন এখানে ; একটু বেড়িয়ে-টেড়িয়ে তাই দেখে আসি।'

ভেবে চিন্তে কবরেজ মশাই বললেন, 'এ সময়ের মধ্যে দেখে আসার মত আছে এখানে চিড়িয়াখানা,তা আপনারা কলকাতার লোক, এ চিড়িয়াখানা আর কি দেখবেন, তার পথেই পাবেন 'কৃষ্ণসাগর'—হ্যাঁ, তা একটা দেখবার জিনিস বটে। মানে, বাংলা দেশে এত বড় দীঘি আর নেই।'

নোয়াখালি-কুমিল্লা-ত্রিপুরা রাজ্যের নামজাদা বড় বড় দীঘি দেখেছি আমি ; শুনে বিস্মিত হলাম, 'কৃষ্ণসাগর' যদি তার চেয়েও বড় দীঘি হয়, তাহলে দেখবার জিনিস তো বটেই।

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না।

পথের নির্দেশ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

সাগরকিনারায় পৌঁছে কিন্তু একেবারেই নিরাশ হয়ে গেলাম। কবরেজ মশাই বোধ হয় ঢাকার নিজের গ্রাম থেকে সোজা এই বর্ধমানের শহরে এসে পৌঁছেছেন, তা ছাড়া আর কিছু দেখেন নি কখনও। দেখবার মত যে সব দীঘি আমি বাংলা দেশেই দেখেছি, তার কাছে এ সাগর তো একটা ডোবা! এত বাড়িয়েও লোকে বলতে পারে! তবে হ্যাঁ, 'কৃষ্ণসাগরের' একটা বাহার আছে—যা তার বৈশিষ্ট্য। প্রথমে চার পাড় বেশ উঁচু, ঘাসে আর ঝোপজঙ্গলে ঢাকা, পাড়ের শীর্ষে জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট কামান সাজানো—বোধ হয় খেলনা-কামান। উঁচু পাড়ের পরে চারদিক ঘেরা লাল শুরকি-বাঁধানো রাস্তা, তার মধ্যে স্বচ্ছ নীল জলের দীঘিটি—যেন ডবল ফ্রেমে আঁটা একখানা ছবি, আবার পাড় আর রাস্তা সমেত দীঘিটি—সেও একখানা ছবি।

মুখোমুখি দুই উঁচু পাড়ের মাঝখান কেটে প্রবেশ পথ। সেখান দিয়ে লাল রাস্তায় গিয়ে পড়লাম। বাঁদিকে চলতে লাগলাম। এদিকের অর্ধপথ শেষ করে, কোণ ঘুরে বাঁদিকের টানা লম্বা পথ ধরে এগিয়ে চললাম। মনোরম দৃশ্যে পরিবেশটি মধুর, তারই ছোঁয়া লেগেছে মনে। মন্থরপদে আপন মনে এগিয়ে চললাম। একটা গানের পদও বুঝি মুখে তাল খেলাতে লাগল—'গ্রামছাড়া ওই রাঙামাটির পথ আমার মন ভুলায় রে।'

টানা রাস্তাটার অর্ধেকের ওপর পেরিয়ে এসে, দাঁড়িয়ে পড়তে হল। বাঁদিকে, উঁচু পাড়ের কোলে একটা আম গাছ, তার তলায় পথের অনেকখানি জুড়ে একটা হনুমান-সম্মেলন বসেছে—অন্তত নিখিল বর্ধমাননগর হনুমান মহাসম্মেলন বলা চলে তাকে। কো-প্রথা, মানে, হনুমতীরাও আছেন বহু সংখ্যায়, সেটা অনুমান করলাম অনেকেরই কোল-আঁকড়ানো ছোট ছোট শ্রীমান হনু দেখে। বাকিরা যে স্ত্রী এবং কিছুতেই পুং নয়, এমন কথা সঠিক বলতে পারার মত বিজ্ঞান আমার জানা নেই।

কেউ কেউ আমার দিকে একবার তাকিয়েই আবার নিজ নিজ কর্মে মন দিল। কর্ম যে কি, তা শ্রীরামই জানেন, সবাই তো দেখলাম চুপচাপ বসে আছে, কেউ কেউ বা একটু গা চুলকিয়ে নিচ্ছে; এ ছাড়া আমার দিকে চেয়ে একটু মুখ-ভ্যাংচাবার অভদ্রতাও কেউ দেখাল না। কে জানে কারো ভাষণ চলছিল কিনা, আমার আবির্ভাবে যদি বাধা পেয়ে থেমে গিয়ে থাকে।

এগোতে ভরসা পাচ্ছিলাম না, সভাভেদ করতে উদ্যত হলে যদি ওদের সভ্যতা ভঙ্গ হয়! নখী-দন্তীর ধৈর্যের ওপর আস্থা করবার উপদেশ তো কোন বিজ্ঞান দেন নি কোনকালে।

কিন্তু আমায় অবাক করে ভদ্রতার একেবারে পরাকাষ্ঠা দেখাল তারা; হঠাৎ হুট্‌পাট্ করে, লাফ-ঝাঁপ মেরে আমগাছে উঠে গেল—সবাই, একটিও রইল না নিচে। এখানে এদের

কোন ট্রেনিং ফ্রেনিং-এর ব্যবস্থা আছে নাকি ! মনে মনে একটু হেসে আমি সামনের দিকে অগ্রসর হলাম। কিন্তু দু'পা মাত্র—তার বেশি আর এগোবার সামর্থ হল না আমার। একেবারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সামনে, দু'হাত দূরেই বিশাল এক গোখ্‌রো সাপ, ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে—তাও বুঝি দু'হাতের কম উঁচু হবে না।

সাপুড়ে পাড়াগাঁয়ের লোক আমি, গোখ্‌রো জীবনে ঢের দেখেছি, কিন্তু অত বড় গোখ্‌রো সাপ তার আগেও কখনও দেখিনি, তাব পবেও আজ পর্যন্ত না।

সাপের ফোঁসানিকে যে গর্জন বললে কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না, সে অভিজ্ঞতাও হল তখনই। মোটায় লম্বায় যেমন তার আয়তন, তেমনি লম্বা তার ফণা। সামনে-পেছনে সে দুলছে, প্রতিবার সামনের দিকে ঝোঁকার সঙ্গেই মনে হচ্ছে তার দোফলা জিভ বুঝি আমার নাগাল পেয়ে গেল। সবচেয়ে ভয়ানক তার অতি ক্ষুদ্র দুটো চোখের চাউনি; সে দৃষ্টি আমার দৃষ্টিকে নিশ্চল করে রেখেছে তার দিকে, ধীর দৃঢ়তায় সে দৃষ্টি আমাকে আকর্ষণ করছে তার দিকে, হিম অসাড় করে দিচ্ছে আমার সর্বাঙ্গ—আমার সর্ব চেতনা।

কি করব আমি ? চিৎকার করব ? কিন্তু সেটাই যদি আমাকে তার দংশন করবার কারণ হয়ে দাঁড়ায় ? চিৎকার করলে শুনবে কে ? দীঘির চতুঃসীমানার মধ্যে একটি মানুষও তো দেখিনি। ছোটবার উপায় নেই, গোখ্‌রোর ছোটা আমি

দেখেছি—ওর সঙ্গে ছুটে আমি পারব না। পাশের দিকে জলে ঝাপিয়ে পড়ব? ওর সঙ্গে সাঁতরে আমি পেরে উঠব না। ওকে ডিঙিয়ে এক লাফ মেরে ওর পেছন দিকে পালাব? কিন্তু আমার নড়বার ক্ষমতা কোথায়? বিজ্ঞজনের উপদেশ শুনেছি, গোখরোর সামনে পড়লে, নড়তে নেই, নড়লেই ছোবল মারবে। উপদেশকদের আমি জানাচ্ছি, গোখ্‌রোর সামনে পড়লে নড়া যায় না, নড়বার ক্ষমতা থাকে না।

কিন্তু এমন অসহায় মৃত্যু লেখা ছিল আমার ললাটে! বাঁচবার জন্য কোন চেষ্টাই করতে পারব না! ও ছোবল মারলে কি হবে? সর্বাঙ্গ জ্বলে পুড়ে যাবে আমার! বিষে নীল হয়ে যাবে সর্ব দেহ! কি যন্ত্রণাময় না জানি সে অনুভূতি।

নিরুপায় আমি, নিঃসহায়। অনুভব করলাম, আপাদমস্তক কাঁপতে শুরু করেছি আমি, নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখবার শক্তি লোপ পাচ্ছে ক্রমেই। আর একটু বেশি করে কাঁপলেই সে ছোবল মারবে আমায়!

ভগবানকেই স্মরণ করলাম। তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক ভগবান। বৈধব্যের রিক্ত বেশে একখানি মুখ মনে পড়ল—তার সঙ্গে চার মাস আগে আমার বিয়ে হয়েছে। মনে পড়ল, বৃদ্ধ পিতা-মাতার আর ভাইদের মুখ। আমিই বাবা-মা'র বড় ছেলে। দিদির কথা মনে হল—কি করে তুমি নিজেকে সান্ত্বনা দেবে দিদি, যখন জানতে পারবে যে···

ভিজে উঠল দুটি চোখ। ঝাপসা হয়ে গেল সামনের সেই

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না

উদ্যত মহাকাল!

হঠাৎ চোখের পলকে ভেল্‌কিবাজির মতই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। ওপরের আমগাছের ডাল থেকে ধুপ্‌ করে লাফিয়ে পড়ল বাচ্চা কোলে একটা হনুমান; লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিমেষে আর একটা লাফ মেরে সে সরে গেল আম গাছের গুঁড়ির দিকে। আচমকা ভয় পেয়ে সাপটাও নিমেষ মধ্যে ফণা আছড়ে ফেলল, অথবা ছোবলই মারল কিনা কে জানে! যাই করুক, আমি দেখলাম, তার ফণাগুটানো মুখটা থুবড়ে পড়ল মাটির ওপর, কোণাকুণি—একটু পাশের দিকে, আমার থেকে প্রায় হাতখানেক দূরে। আর সেই কোণাকুণি পথ ধরে অদ্ভুতভাবে, যেন খানিকটা লাফাতে লাফাতে সে সোঁ সোঁ করে ঢুকে গেল পাড়ের জঙ্গলে। উদ্যত অবস্থায় আচমকা ভয় পেলে গোখ্‌রোর আর ছোবল মারা হয় না—একথা আরও অনেকের মুখেই শুনেছি, তখন সে পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়।

আমি সেই পথের ওপর ধপ্‌ করে বসে পড়লাম অসাড়-ভাবে। বসে বসে গল্‌গল্‌ করে ঘামতে লাগলাম আর থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগলাম। একটু নড়বার মত বল যখন পেলাম দেহে, সবার আগে ওপর দিকে তাকালাম। দেখি, গভীর উৎকণ্ঠাভরা সম্মিলিত দৃষ্টিতে সব কটি হনুমান আমার দিকে চেয়ে আছে গাছের ওপর থেকে।

যোগাযোগ

রেবা দাস

ভদ্রলোকটি একজন সরকারী চাকুরে, হাত দেখতে পারেন খুব ভাল, তবে এটা তাঁর বৃত্তি নয়, নেহাৎ খেয়াল ও শখ। প্রায় ১৫।১৬ বছর ধরে হস্তরেখা সম্বন্ধে গবেষণা করছেন। বাড়ি জলপাইগুড়ি জেলায়। নাম আদিনাথ চৌধুরী। কলকাতায় বিশেষ কাজে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। সেদিন সকালবেলা আমার বন্ধুর সঙ্গে বসে গল্প করছি, এমন সময় চাকরের মুখে খবর পেলাম নিচে আদিনাথবাবু এসেছেন। বন্ধুকে নিয়ে আদিনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ড্রইং

রুমে গিয়ে দেখি মা, কাকিমা, ঠাকুমা, পিসিমা আর ভাই-বোনেরা আদিনাথবাবুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন আর এক এক করে হাত দেখার পালা চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে জলযোগের পর্বও চলেছে! দু'রকমভাবে মুখ চলার দরুণ আড্ডাটি বেশ জমেছে দেখে আস্তে আস্তে দুটো চেয়ার নিয়ে বসে পড়লাম দুজনে। আমাদের সকলের হাত দেখানোর পর আমার বন্ধু তার হাত দেখালো। তার দুটি হাত মনোযোগ দিয়ে দেখে আদিনাথবাবু বললেন, হুঁ. দেখা হয়েছে, এবারে বলো তুমি কি জানতে চাও? বন্ধুর মাথায় দুষ্টু সরস্বতী ভর করেছিলেন, তাই সে বলল, আচ্ছা আমি ম্যাট্রিক পাস করতে পারব কিনা বলুন তো!

আমরা সকলেই ওর পরীক্ষা করার মতলব বুঝতে পেরে উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আদিনাথবাবু তার হাতের দিকে আরো খানিকক্ষণ তাকিয়ে বললেন, তোমার হাতের রেখা অনুসারে তো দেখছি, পাঁচ বছর আগে ম্যাট্রিক পাস করা উচিত ছিল, কিন্তু তুমি যখন রেবার বন্ধু, তখন শুধু ম্যাট্রিক কেন, আরো কিছু পাস করেছ বলেই তো মনে হয়। এটা নেহাৎ তোমার পরীক্ষা করার মতলব, না? কিন্তু তোমার এই পরীক্ষা করার ব্যাপারে অনেক দিন আগেকার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল।

একটু থেমে আদিনাথবাবু বলতে লাগলেন, জলপাইগুড়িতে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে একজন ধনী উচ্চপদস্থ সরকারী

কর্মচারীর বাড়ি আলাপ করতে গিয়েছিলাম। কথায় কথায় আমি ভাল হাত দেখতে পারি জেনে গৃহস্বামী আর তাঁর ছোট ভাই কৌতূহলী হয়ে আমাকে হাত দেখালেন। তাঁদের হাত দেখার পর গৃহস্বামী তাঁর মেয়ের হাত দেখার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন। আমি সম্মতি জানাতেই মেয়েটি এসে আমাকে নমস্কার করে বসল। মেয়েটিকে দেখে অবিবাহিতা বলেই মনে হল। সদ্য স্নান করে এসেছে, দেখে সুন্দরী বলা যেতে পারে অনায়াসে। হাত দেখছি, মেয়েটি হঠাৎ প্রশ্ন করল, আচ্ছা বলুন তো আমার কবে বিয়ে হবে? প্রশ্নটা শুনে বিস্মিত হয়ে গেলাম, কারণ নিজের থেকে নিজের বিয়ের কথা জানতে সাধারণত কেউ চায় না, আর যখন মেয়েটির বাবা, কাকা এখানেই উপস্থিত আছেন। প্রশ্নটা আমি এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলাম অন্য কথা বলে। কিন্তু খানিক পরে মেয়েটি আবার প্রশ্ন করল, বলুন না আমার কবে বিয়ে হবে? দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করতে দেখে ভাবলাম, আজকালকার আধুনিক সমাজের মেয়ে, বিয়ে জিনিসটার ওপর গুরুত্ব দেয় না। গৃহস্বামী ও তাঁর ভাই নীরবে বসেছিলেন দেখে অগত্যা আমি গৃহস্বামীকে বললাম, দেখুন উনিশ বছরে যদি এ মেয়ের বিয়ে না হয়ে থাকে তাহলে আর কোনদিনই বিয়ে হবে না। আর এ মেয়ের যদি উনিশ বছরে বিয়ে হয়েও থাকে তাহলে এ মেয়ে কোনদিন শ্বশুর-ঘর করে নি।"

কয়েক সেকেণ্ড নীরব থেকে আদিনাথবাবু আবার শুরু-

করলেন, আমার কথা শুনে মেয়েটির মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। গৃহস্বামী ও তাঁর ভায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁদের মুখেরও ঐ এক অবস্থা। মেয়েটি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি একটু বসুন, আমি আসছি। বলে দ্রুত পায়ে ভেতরে চলে গেল। তারপর খানিক পরে ফিরে এসে যখন আমার সামনে দাঁড়াল তখন আমি তার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। মেয়েটি টক্‌টকে লালপেড়ে একটি শাড়ি পরেছে, হাতে শাঁখা, নোয়া (যা আগে ছিল না), কপালে বড় সিঁদুর টিপ। আমাকে বিস্ময়ে হতবাক দেখে মেয়েটি বলল, 'দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আমি বিবাহিতা, শুধু আপনাকে পরীক্ষা করার জন্যে আমি এ ছলনাটুকু করেছি, তার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।' আমার সর্বশরীর তখন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে এই কথা ভেবে যে, আমার হাত দেখতে জানার সামান্য বিদ্যাটাকে যাচাই করার জন্য হিন্দুঘরের সধবা মেয়ে দিন-দুপুরে (তখন ঠিক বেলা ১১-৪০) হাতের শাঁখা, নোয়া খুলে, মাথার কপালের সিঁদুর মুছে কৌতুক করতে পারে? একথা ভাবতেই পারি না! একি সম্ভব? কেন এর এমন দুর্বুদ্ধি হল? একি গ্রহের ফের? এর কি স্বামীর অমঙ্গলের ভয় নেই? চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি, মেয়েটি প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা আমার হাত দেখে যা বললেন, তা কি সত্যি?' মনটা বিরূপ হয়ে গিয়েছিল, উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, যা বলেছি, তা সত্যি বলেই বলেছি, তবে এটুকু জানার জন্য এত কাণ্ড না

করলেই ভাল করতেন। বলে নমস্কারাদির পালা সেরে বন্ধুকে নিয়ে চলে এলাম।

রাস্তায় আসতে আসতে বন্ধুর কাছে শুনলাম, গৃহস্বামী তাঁর ঐ একটি মাত্র মেয়েকে ভাল ঘরেই বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মেয়েটির শ্বশুরঘর করা ঘটে ওঠেনি। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ফুলশয্যার দিন মেয়েটি জানতে পারে যে স্বামীর টি বি আছে। পরের দিনই মেয়েটি সেই যে বাপের বাড়ি চলে আসে তারপর আর শ্বশুরবাড়ি যায় নি। সে আজ বছর দুয়েক আগে, তখন মেয়েটির উনিশ বছর বয়স। স্বামীর সঙ্গে মাঝে মাঝে পত্রের আদান-প্রদান থাকলেও শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ নেই। স্বামী এখন যাদবপুরে।

এর পর দিন সাতেক পরে বন্ধুটির সঙ্গে আমার দেখা হয়। তার কাছে খবর পেলাম মেয়েটির স্বামী মারা গেছে, আমি যেদিন মেয়েটির বাড়ি যাই, সেইদিন বেলা ১১-৪০ মিনিটে। আর ঠিক ওই ১১-৪০ মিনিটেই মেয়েটি আমাকে পরীক্ষা করার জন্য স্নান করে এয়োতির চিহ্নগুলো ত্যাগ করে।

এখন তর্কের খাতিরে বলতে গেলে বলতে হয় যে, মানুষ মাত্রেই মরণশীল, কাজেই স্বামীকেও একদিন মরতে হত আর স্ত্রীকেও এয়োতির চিহ্নগুলো নষ্ট করতে হত। কিন্তু আমার প্রশ্ন, ঠিক একই দিনে সেই একই সময়ে বেলা ১১-৪০ মিনিটে ওদিকে স্বামীটি মারা গেল আর স্ত্রীও এয়োতির চিহ্নগুলো নষ্ট করল, অথচ মেয়েটি জানে যে, এই সামান্য খেয়াল মেটাতে

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না

সে কতখানি কঠোর বাস্তবের রূঢ় সত্যকে প্রকাশ করল ? মেয়েটি এয়োতির চিহ্নগুলো নষ্ট না করলে কি স্বামীটি বাঁচত, না স্বামী মারা গেল বলেই ঠিক সেই সময় দৈব স্ত্রীকে এয়োতির চিহ্নগুলো নষ্ট করতে বাধ্য করালো ?

ঠাকুরাণীর বাঘ

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচী

সময়ে সময়ে আমাদের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা প্রচলিত আইন-কানুনের আওতায় পড়ে না। এ ধরনের ঘটনা প্রতিদিন ঘটে না,—ঘটলে হয়ত এর কারণ সম্বন্ধে গবেষণা করা হ'ত।

আমি তখন কটকে থাকি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু পূর্বের ঘটনা। হঠাৎ আমাদের শিকারের নেশায় পেয়ে বসল।

বালেশ্বরে থাকতে আমি বহুবার শিকারে গিয়েছি এবং শিকারও করেছি, কিন্তু আমি শিকারী ছিলাম না। যাঁদের

সঙ্গে শিকারে যেতাম তাঁদের দুই-একজন ভিন্ন অন্য সবাই যে শিকারী ছিলেন এমন মনে হয় না।

সারা দিনের পরিশ্রমের পরে একটু আনন্দ লাভের আশাতেই আমরা শিকারে যেতাম। রাত নটা-দশটায় কাঠজুড়ি নদী পার হ'য়ে উদয়গিরি-খণ্ডগিরির ভিতর দিয়ে খণ্ডগিরি ডাকবাংলো পর্যন্ত আমাদের সীমা ছিল। এই রাস্তার দু'ধারে বিখ্যাত চাঁদকার জঙ্গল। দীর্ঘ বার মাইল স্থান জঙ্গলাকীর্ণ। বড় বড় গাছ, ঝোপ, কাঁটাগাছ এবং অন্যান্য ছোট-বড় গাছের মাঝে সর্বপ্রকার জন্তু-জানোয়ারের আবাস। এই বার মাইলের মধ্যে কোন :লোকালয় নেই। বনের একাংশে পাহাড়শ্রেণী। বনের অধিকাংশ স্থান সরকারী বন-বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত এই বনে হাতী, বাঘ, সম্বর, হরিণ প্রভৃতি সবই আছে। যদিই কারো সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয় এই আশায় আমরা প্রায় প্রতি রাত্রে ঐ জঙ্গলটি দু-তিনবার পারাপার কবতাম।

শিকারী হ'তে হ'লে যে সব গুণ থাকা দরকার, আমাদের তা ছিল না। সাহস, শক্তি, ক্ষিপ্রগতিতে লক্ষ্য স্থির করা, এসবের বালাই আমাদের ছিল না, তবু আমরা শিকারে যেতাম।

পায়ে হেঁটে পাহাড়ে-জঙ্গলে শিকার করেছি মাত্র কয়েক-বার। সেও দিনের বেলায়, বন্ধু-বান্ধব, লোকজন নিয়ে এবং সর্বদাই প্রার্থনা করেছি—'হে ভগবান, হঠাৎ সামনাসামনি হাতী কিংবা বাঘের সঙ্গে যেন দেখা করিয়ে দিও না।' কিন্তু সে সব

বালেশ্বর জেলায় নীলগিরি অঞ্চল এবং ময়ূরভঞ্জের কথা। কটকে এসে শিকার বন্ধ করেছিলাম—তার কারণ শিকারের জন্য আমি শিকার করতাম না। 'মৃগয়া করিতেন কভু প্রভু, কিন্তু জীবনাশে সতত বিরত—' গোছের অবস্থা।

আমি শিকার করতে যেতাম বন্ধু-বান্ধব নিয়ে একটু আনন্দ করতে। শিকারের উত্তেজনাই ছিল বড় কথা। বালেশ্বরে সেই সব বন্ধুবান্ধব ছেড়ে এসে কটকে আর নতুন ক'রে শিকার পার্টি গঠন করিনি। অথচ এখানে এসে শিকারের যে সুবর্ণ-সুযোগের বর্ণনা শুনতাম তাতে শিকারে যেতে খুব ইচ্ছা হ'ত।

ঠিক এই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটল, যে ঘটনার পরে শিকার পার্টি গঠন করতে আর কাল বিলম্ব করলাম না।

ঘটনাটি এই : রায় বাহাদুর নীলমণি চট্টোপাধ্যায়, উড়িষ্যার ডিরেক্টর অব এগ্রিকালচার (এখন পেন্সনপ্রাপ্ত), একজন অমায়িক এবং সদালাপী ভদ্রলোক। সবার সঙ্গেই তাঁর সমান ব্যবহার। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। তিনি কটক থেকে বহু দূরে কোথায় যেন 'টুরে' গিয়েছিলেন। ফেরবার সময় যখন তিনি চাঁদকার জঙ্গলে প্রবেশ করেন তখন রাত প্রায় দু'টো। রায় বাহাদুর মোটরের পিছনের সীটে আরামে ঘুমুচ্ছিলেন। ড্রাইভার জনশূন্য রাস্তায় তীরবেগে মোটর চালাচ্ছিল।

জঙ্গলের মাঝামাঝি এসে ড্রাইভার দেখতে পায় একটি বাঘ তিনটি শাবক নিয়ে রাস্তার উপর খেলা করছে। মোটরের তীব্র আলোর দিকে বাঘটি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে

রাস্তার পাশের জঙ্গলে প্রবেশ করে। তার সঙ্গে দুটি শাবকও চ'লে যায়, কিন্তু তৃতীয়টি আলোর দিকেই চেয়ে থাকে।

এসব ঘটনা রায়বাহাদুর কিছুই জানেন না। তিনি তখন বেশ ঘুমুচ্ছেন। বাঘের কাছে মোটরের গতি কমানো ঠিক হবে না মনে করে ড্রাইভার একই গতিতে মোটর চালাচ্ছিল। মনে করেছিল তৃতীয় শাবকটিও এখনই চ'লে যাবে। কিন্তু সে নড়ল না। ফলে শাবকটি চাপা পড়ল।

হঠাৎ মোটরের তীব্র ঝাঁকানিতে রায় বাহাদুরের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—'কি হল?'

ড্রাইবার সব ঘটনা বলল।

রায়বাহাদুর বললেন,—'মরেছে তো?'

ড্রাইভার বলল,—'খুব সম্ভব।'

ততক্ষণে মোটর অনেকটা এগিয়ে এসেছে। রায়বাহাদুর বললেন,—'মোটর ঘোরাও, দেখে আসি।' ফিরে গিয়ে তাঁরা দেখলেন—বাচ্চাটি রাস্তার উপরেই মরে পড়ে আছে। বাঘটি অপত্য-স্নেহে অন্ধ হ'য়ে পথ ভুলে কোথায় কোন বনে চ'লে গেছে তার ঠিক নেই।

রায়বাহাদুর তবু সাবধানতা অবলম্বন করলেন। মৃত শাবকটির পাশে মোটর থামিয়ে মুহূর্তে তাকে তুলে নিয়ে জোরে মোটর ছাড়লেন।

পরদিন তিনি মিস্টার সেনকে (রাণীহাটের বিখ্যাত সেন পরিবার) বললেন,—'তোমরা বন্দুক, রাইফেল নিয়ে শিকারে

যাও, বাঘ মারতে আবার ও-সব কোন কাজে লাগে ? এই দেখ, আমি শিকার করেছি বিনা অস্ত্রে। বাঘ শিকারটা কিছুই নয়—তবে বড্ড ঝাঁকুনি লাগে !'

সেই থেকে আমি শিকার পার্টি গঠন করলাম। আমার ধারণা হ'ল চাঁদকার জঙ্গলে বাঘের রীতিমত স্থানভাব ঘটেছে তাই তারা জঙ্গল ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। ওখানে গেলে দু'দশটা বাঘের দেখা পাওয়া যাবেই।

আমাদের দলে দু'জন বন্দুকধারী এবং দু'জন পরম উৎসাহী ছিলেন। উৎসাহী ভদ্রলোক দু'জনের বন্দুক ছিল না। তাঁদের একজন সুশীল ঘোষ (তখন তিনি পুরী ব্যাঙ্কে কাজ করতেন), অপর জন মৃণালকান্তি সেন (সেন পরিবার)।

আমরা কখন মোটর থেকে নেমে শিকার করতাম না। আমরা স্পট্ লাইট্ ফেলে জঙ্গল অনুসন্ধান করতে করতে এগিয়ে যেতাম। কোন জানোয়ারের চোখ জ্বলে উঠলেই করতাম গুলি.। তা সে যে জানোয়ারই হোক। আমাদের কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না। প্রথম প্রথম আমি চোখ দেখে বুঝতেও পারতাম না সেটা কোন্ জানোয়ার।

একবার এক সম্বর গুলি করলাম। রাস্তার পাশে ছোট ছোট গাছের ঝোপ। তারই ভিতর সম্বরটি দাঁড়িয়েছিল। গুলি খেয়ে সম্বরটি ছটফট করতে লাগল। জঙ্গলের ভিতর ভীষণ আলোড়ন হচ্ছে। শিকার ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। কিন্তু মোটর থেকে নেমে জঙ্গলে ঢুকে তাকে টেনেই বা

কে জানে! হরিণ, সম্বর প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাঘ ঘুরে বেড়ায়।

মৃণালবাবু নেমে পড়লেন। শিকার ছেড়ে তিনি যাবেন না। বললেন,—'স্পট্-লাইট্ ধর, আমি নিয়ে আসছি।' তিনি আমাদের বাধা মানলেন না। অগত্যা আমরা মোটর থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বন্দুক ধ'রে রইলাম, স্পট্-লাইট দেওয়া হল। তিনি জঙ্গলে ঢুকলেন। আমরা রুদ্ধশ্বাসে প্রহর গুণতে লাগলাম।

তারপরে রীতিমত অবস্ট্যাকল রেস। সম্বর উঠে দৌড়ুচ্ছে আর মৃণালবাবু তার পিছনে ছুটলেন—কাঁটাগাছ, ঝোপের বাধা কিছুই মানছেন না। সম্বর জোরে ছুটতে পারছে না, তার পিছনের একটি পা ভেঙে ঝুলছে। কিন্তু সে তিন পায়েই ত্রিভুবন ঘুরতে লাগল। ক্রমে স্পট্-লাইটের রেঞ্জ অতিক্রম করে গেল। তাকে ধরা গেল না।

শিকার না পেয়েও আমি কম খুশি ছিলাম না, আমার গুলি ব্যর্থ হয়নি—এইটুকুই আমার আনন্দ। দুই চোখের মাঝে লক্ষ্য করে আমি গুলি করেছিলাম, সম্বর যত বড় ফাঁকিবাজই হোক, সে তার পিছনের পা বাঁচাতে পারেনি।

কিন্তু এ-সব শিকার-পর্বের প্রথম অধ্যায়। ক্রমে বেছে বেছে বাঘের উপর হামলা শুরু করলাম। বাঘের সংবাদ সংগ্রহ ক'রে শিকারে যেতাম। তাতে ফলও ভালই হোত। শিকার-পর্বের প্রথম থেকেই একটি বাঘের সংবাদ পেয়েছিলাম,—সেটি ঠাকুরাণীর বাঘ। এই বাঘের সম্বন্ধে নানাপ্রকার গল্প শুনেছি।

বাঘটি খুব বড় চিতা। এত বড় চিতা ঐ অঞ্চলে আর ছিল না। এই চিতা বাঘটিকে প্রায় প্রত্যেক শিকারীই দেখেছে। সে নাকি কোন মানুষকেই আক্রমণ করে না। কোন শিকারীও তাকে গুলি করে না। দুই একজন অ-হিন্দু নাকি বাঘটিকে গুলি করেছিল কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়েছে।

আমি তখনও বাঘটিকে দেখিনি; তবে ঠাকুরাণীর স্থান দেখেছিলাম। চাঁদকার জঙ্গলের প্রবেশ-মুখে ঠাকুরাণীর স্থান। রাস্তা থেকে সামান্য একটু দূরে একটি গাছের নিচে কতকগুলি সিঁদুরমাখা শিলাখণ্ড দেখতে পাওয়া যায়। তিনিই ঠাকুরাণী। তিনি কোন্ ঠাকুরাণী জানি না। সবাই ঠাকুরাণী বলে—আমিও তাই বলতাম। খুব ছোট একটি মন্দিরও তৈরি করা হয়েছিল। মন্দিরটি পাঁচ ছ'ফুটের বেশি উঁচু হবে না। ঠাকুরাণীর আচ্ছাদন মাত্র।

মোটর থেকে ঠাকুরাণীকে দেখা যায় ব'লেই আমি দেখেছি। তাঁর কাছে যাবার সাহস আমার ছিল না। ঠাকুরাণীর বাঘটি ওরই আশে-পাশে থাকে। সন্ধ্যায় সে একবার আহার অন্বেষণে বেরোয় তারপরে আর তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। ঠাকুরাণীই আশে-পাশে কোথাও থাকে।

আশে-পাশের গ্রামের লোকেরা প্রতিদিন ঠাকুরাণীর পূজো করে। টাটকা ফুল বেলপাতা প্রতিদিনই দেখেছি। বাঘটি নাকি ঠাকুরাণীর প্রসাদ খেয়েই প্রধানতঃ জীবনধারণ করে। বাঘটিকে সবাই শ্রদ্ধা করে।

এককালে কটকের কেলি সাহেবের (Mr. Kelley.) প্রধান উপার্জন ছিল শিকারের চামড়া বিক্রয়-লব্ধ অর্থ। তিনি পাগলা হাতী মেরেও পুরস্কার লাভ করেছেন। তিনি সত্যিই শিকারী।

কেলি সাহেব কারো সঙ্গে শিকারে যেতেন না। একা সাইকেলে রাইফেল এবং টর্চ নিয়ে রাত্রে জঙ্গলে প্রবেশ করতেন। তিনি হরিণ, সম্বর, বাঘ যা পেতেন শিকার করে তার চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে আসতেন। ফিরতে প্রায়ই তাঁর সকাল হ'য়ে যেত। তিনিও ঠাকুরাণীর বাঘের গল্প করেছেন। বহুবার তিনি বাঘটিকে দেখেছেন কিন্তু তিনি গুলি করেননি। তিনি বলেন,—'ঠাকুরাণীর বাঘের কোন ক্ষতি করলে অমঙ্গল হবে।'

এর মধ্যে দশপাল্লা স্টেটে যাবার আমার একটা সুযোগ হ'ল। দশপাল্লা স্টেট শিকারের জন্য বিখ্যাত। পাহাড় এবং বনসম্পদে রাজ্যটি অপূর্ব। প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমনি মনোহর, হিংস্র জন্তু-জানোয়ারে তেমনি ভয়-সঙ্কুল। বহুদিন থেকেই দশপাল্লা দেখার ইচ্ছা ছিল। সুতরাং এ সুযোগ ছাড়লাম না।

কটকের একজন ধনী ব্যবসায়ী দশপাল্লা রাজ্যে জন্তু-জানোয়ারের হাড়ের কনট্রাক্টরি নিতে যাবেন,—সুশীলবাবু তাঁদের সঙ্গে যাবার সব বন্দোবস্ত করেছেন। তাঁরা দু'ভাই, সুশীলবাবু এবং আমি যাব স্থির হয়েছে। তাঁরা মুসলমান ভদ্রলোক। আমার সঙ্গে তাঁরা পরিচিত ছিলেন না।

তাঁদের মোটরখানিও শিকারের উপযোগী, 'টুরার', সিডান বডি নয়। সুতরাং হুড খুলে ব'সে ব'সেই শিকার করা যাবে। গাড়ির বাইরে যেতে হবে না।

আমাদের যাবার বন্দোবস্ত সব ঠিক হ'ল। চারজনের চারটি টিফিন ক্যারিয়ারে রাত্রির খাদ্য ; সদ্যক্রীত গুলি, স্পট্‌লাইট এবং অতিরিক্ত ব্যাটারি প্রভৃতি নিয়ে আমরা প্রায় বিকেল পাঁচটার সময় যাত্রা করলাম। মুসলমান ভদ্রলোক দুজনের রাইফেলটি বাক্স-বন্দী অবস্থায় পায়ের নিচে রইল। আমার বন্দুকটিও বাক্সে ছিল, কিন্তু কাঠজুড়ি নদী পার হবার পরে সুশীলবাবু বললেন, 'একটি বন্দুকে গুলি ভর্তি করে রাখা উচিত। যদি সামনে কিছু পরে তখন আর প্রস্তুত হবার সময় থাকবে না৷

যদিও আমরা 'কোন কিছুর' দেখা পাওয়ার আশা করিনি, তবু তাঁর কথা সমর্থন করলাম।

আমার বন্দুকটিতে গুলি ভর্তি করলাম। রাইফেল বাক্স-বন্দীই রইল। আমি বাঁ-ধারের ব্যারেলে বুলেট এবং ডানদিকের ব্যারেলে 'এল জি' ভর্তি করে প্রস্তুত হয়ে রইলাম—বাঘই হোক আর হরিণই হোক রেয়াৎ করা হবে না।

চাঁদকার জঙ্গলের প্রবেশমুখে একটি 'কাটিং' আছে। দু'-পাশের জমি প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু, মাঝে মাটি কেটে মোটরের রাস্তা করা হয়েছে—রাস্তাটি সম্ভবত বার ফুট চওড়া। দু'-পাশের মাটির প্রাচীর খাড়া দেয়ালের মত। সুতরাং মোটর

ঐ 'কাটিং'-এর মধ্যে এলে ছু' পাশের কিছু দেখা যায় না। কতকটা টানেলের মত, ওপরটা ফাঁকা। এই 'কাটিং' থেকে রাস্তাটি ক্রমশ উঁচু হয়েছে। আমরা যখন ঐ 'কাটিং'-এ প্রবেশ করলাম, তখনও অন্ধকার হয় নি। উঁচু গাছের মাথায় তখনও রোদ আছে। সামনে চড়াই বলে মোটর সেকেণ্ড গীয়ারে ধীরে ধীরে উঠছে। আমরা উপরে উঠতেই সুশীলবাবু চাপা গলায় বললেন, 'বাঘ, শিগ্‌গীর গুলি করুন।' চেয়ে দেখি বাঘই বটে! প্রকাণ্ড একটি চিতা বাঘ আমাদের ডান দিকের 'কাটিং-' এর মাথায় ধীর গতিতে আমাদের বিপরীত দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যে 'কাটিং' আমরা এইমাত্র পার হয়ে এসেছি। বাঘটি ইচ্ছা করলে অনায়াসেই আমাদের 'কাটিং' পার হবার সময় মোটরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত। এখন আমরা বাঘের পিছন দিকে একশ ফুটের মধ্যে। দূরত্ব আরো বেড়ে না যায় তাই মোটর থামিয়ে দেওয়া হ'ল।

বাঘটি বেশ ফাঁকা জায়গার দিকে অতি ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। বাঘটির বাঁ পাশে ছোট ছোট গাছের ঝোপ আর ডান পাশে সেই 'কাটিং'। স্পষ্ট দিবালোকে বৃহদাকার বাঘ লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না তা জানতাম—তবু গুলি করতে দ্বিধা করছিলাম। তার কারণ, আমি বা আমরা বাঘের পিছনটা দেখতে পাচ্ছিলাম, তার মাথা ছিল আমাদের বিপরীত দিকে। গুলি করলে বাঘ আহত হবে মাত্র। আহত বাঘ আমাদের ছেড়ে কথা বলবে না সেটা ভালই জানতাম। তবু এত বড় শিকার এত হাতের

কাছে পাওয়া নিতান্তই ভাগ্যের কথা। এ সুযোগ কখনও ছাড়ব না স্থির করলাম। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম বাঘটি যখন ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দেখবে তখনই গুলি করব।

কিন্তু বাঘটি পিছন ফিরে একবারও চেয়ে দেখল না—তার পালানোরও কোন গরজ দেখা গেল না। কোন দিকে তার দৃক্‌পাত নেই।

সুশীলবাবু অধীর হয়ে উঠলেন, 'কই মারুন!' তিনি পায়ে চিম্‌টি কাটতে লাগলেন।

আমার মনে একটু ভরসাও হ'ল। একবার সম্বরের ছুটো চোখের মাঝে লক্ষ্য করে গুলি করেছিলাম, তাতে সম্বরের পিছনের একটি পা ভেঙ্গেছিল। এবারে বাঘের পিছনের পা লক্ষ্য করে গুলি করা যাক, ভাগ্যে থাকলে বাঘের মাথাও ভাঙতে পারে।

আর কালবিলম্ব না করে বুলেটের ঘোড়া টিপলাম। ঠক্ করে একটি আওয়াজ হ'ল মাত্র। আমি বিস্মিত এবং ভীত হয়ে পড়লাম। এরূপ অভিজ্ঞতা আমার পূর্বে ছিল না। ঠিক এই সময়ে বাঘটি একবার উদাস দৃষ্টিতে পিছনে তাকিয়ে দেখল। আমি তৎক্ষণাৎ ডানধারের ঘোড়া টিপলাম। এবার আমার বিস্ময়ের সীমা ছাড়িয়ে গেল। এবারেও একপ্রকার ঠক্ করে আওয়াজ হ'ল কিন্তু ফায়ার হ'ল না। আমার গুলি কখনও এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। পূর্বেও কখনও এরূপ হয়নি, পরেও কোনদিন হয় নি।

এই সময়ে সুশীলবাবু বললেন,—থামুন থামুন। ঠাকুরাণীর বাঘ নয়তো!' মুসলমান ভদ্রলোকটি তাঁর সীটের উপরে দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখে বললেন,—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠাকুরাণীর বাঘই তো বটে! চলুন, আর গুলি হবে না।'

সেই দিনই প্রথম আমি ঠাকুরাণীর বাঘকে দেখলাম। কি শান্ত, কি ভয়-লেশহীন পদক্ষেপ। কি উদাস দৃষ্টি। কেউ যে তার কোন অনিষ্ট করতে পারে সে ধারণাই তার নেই। তার কোন কৌতূহলও নেই। যেন শান্ত সমাহিত সন্ন্যাসী।

'গুলি তার গায়ে লাগে না'—কথাটি বহুবার শুনেছিলাম। মনে করেছিলাম হয়ত শিকারী দৈবাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। কিন্তু এভাবে গুলির কণ্ঠরুদ্ধ হবে তা কোনদিন কল্পনা করিনি। জন-শ্রুতিতেও এ-ধরনের ব্যর্থতার কথা পূর্বে শুনিনি।

আমরাও এগিয়ে চললাম—বাঘটিও ধীরে ধীরে তার বাঁ ধারের ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করল। কোন ব্যস্ততা নেই। যেন পায়ে কাঁটা না ফোটে, গায়ে কাঁটার আঁচড় না লাগে এই ভাবের সাবধানতা তার গতিতে। বাঘটি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হ'ল। আর একটু এগিয়েই ঠাকুরাণীর মন্দির। মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উদ্দেশে প্রণাম জানালাম।

আমার দশপাল্লায় শিকারে যাবার কথা উঠতেই আমি সর্ব-প্রকারে প্রস্তুত হয়েছিলাম। নূতন গুলি কেনা হয়েছিল। তর্কের খাতিরে যদিই ধরে নেওয়া যায় যে এই সদ্যক্রীত গুলি অকেজো ছিল, কিন্তু দোকান থেকে বেছে বেছে ঐ দুটি

অকেজো গুলিই কি আমাকে দেওয়া হয়েছিল? আর আমিও পঞ্চাশটা গুলির মধ্য থেকে বেছে ঐ দুটি গুলিই সর্বপ্রথমে বন্দুকে ভর্তি করেছিলাম?

কোন যুক্তিই আমার মনে সায় দেয় না। দশপাল্লায় গিয়ে সে রাত্রে আরো শিকার করেছি কিন্তু কোন গুলিই ব্যর্থ হয়নি। শুধু সেদিন কেন, এই ঘটনার পূর্বে বা পরে কখনও এভাবে গুলি ব্যর্থ হয়নি।

অদৃশ্য শক্তি সম্বন্ধে অবিশ্বাসী মন নিয়েও এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হলে মনের পরিবর্তন ঘটে। আমার বুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে সব কিছুই পড়ে না—গণ্ডীর বাইরে অনেক কিছু আছে যার ব্যাখ্যা চলে না।

ঠাকুরাণীর বাঘটিকে দেখলে কেমন যেন অপার্থিব জগতের কথা মনে জাগে। কিন্তু কেন এমন হয়? তাকে দেখলে ভয় হয় না এমন নয়, তবে সেটা আতঙ্ক নয়, ভয়ের মাঝেই কেমন যেন একটা অভয়ের সুর বাজে! এর পরে আর একবার মাত্র ঐ বাঘটিকে দেখেছিলাম, সেবারে একটি হরিণকে গুলি করে-ছিলাম। জঙ্গলের মধ্যে তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না, সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় লক্ষ্য স্থির হয়নি, ফলে হরিণটি আহত হয়েছিল মাত্র। আহত হরিণকে অনুসরণ করে একটুখানি এগিয়ে যেতেই দেখি ঠাকুরাণীর বাঘ! বাঘটি দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশ দিয়ে আহত হরিণ ছুটে পালিয়ে গেল। বাঘটি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না। আমার দিকেও না। শুধু সে দাঁড়িয়ে

রইল। কোন দিকে তার কৌতূহল নেই, কোন বিষয়ে নেই তার উৎসাহ। সেই শান্ত ধ্যানমূর্তি।

আমার খুব যে ভয় হচ্ছিল তা নয়, তবে সাবধানতা অবলম্বন করলাম। বাঘটির দিকে লক্ষ্য রেখে পিছু হটে ফিরে এলাম, যতক্ষণ তাকে দেখা গেল, দেখলাম—সে একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসী যেমন পারিপার্শ্বিক সব কিছু ভুলে যায়, বাঘটি যেন ঠিক সেইভাবে সব ভুলে গেছে, তার জীবনের শঙ্কা নেই, নেই তার জীবহিংসার প্রেরণা। সর্বদাই সে ধ্যানমগ্ন।

১৯৪৫ সালে বাঘটিকে শেষবার দেখেছি তখন তার বৃদ্ধাবস্থা। এখনও সে জীবিত আছে কিনা জানি না—কিন্তু থাকলে যেন ভাল হয়, মনে মনে প্রার্থনা করি বাঘটি যেন দীর্ঘজীবী হয়। এই সঙ্গে ঠাকুরাণীকেও আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

অশরীরীর ইঙ্গিত

শৈলেন ভট্টাচার্য

ঘটনাটি অবিশ্বাস্য অলৌকিক মনে হলেও আজও সে রাতের কথা ভাবলে শঙ্কিত হয়ে উঠি। কল্পনা করতে পারি না, কি করে এই নির্ভীক পর্যটক-জীবনে ঐ রকম অবাস্তব ঘটনা ঘটে গেল—যা সাধারণের গোচরীভূত করলে গাল-গল্প, পাগলামির পরিচায়ক বলে মনে হবে।

সাইকেলে সারা ইংল্যাণ্ড ঘুরতে ঘুরতে হাজির হলাম কর্ণওয়াল অঞ্চলে। ইচ্ছা ছিল সমগ্র ইংল্যাণ্ড ঘুরে পাড়ি দেব জার্মাণীর পথে। প্লাইমাউথে এক সমস্যা উপস্থিত হল,

এখন যাই কোন্‌দিকে। সামনের মোহনায় ৩০নং রাস্তা রুদ্ধ হয়ে গেছে। এখান দিয়ে যেতে গেলে হয় জলপথে ডোরপয়েণ্ট, না হয়, উল্টো নাক দেখার মত চলতে হবে ৩৮৬ ও ৩৩৮নং রাস্তা ধরে লন্‌সেস্‌টন্‌ পর্যন্ত ৫০ মাইল ঘুরে ৩০ নং রাস্তা ধরবার জন্যে। তারপর আছে আরও ৩০ মাইল রাস্তা, যাতে বোড্‌মিনে পোঁছান যায়। অর্থাৎ, ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রী। নদীপথ এড়িয়ে চলতে গিয়ে ৮০ মাইল অতিরিক্ত খেসারতি দেওয়া। ঘোরার চেয়ে ঘুরুনির কথা ভেবে পাড়ি দিলাম ডেভেন্‌পোর্ট হতে ডোরপয়েণ্ট চার শিলিং ভাড়া দিয়ে। ৩৮নং রাস্টার সমাপ্তি ঘটেছে বোড্‌মিনে ৩০নং রাস্তায় গিয়ে। লিস্‌ফোর্ডে যখন হাজির হলাম তখন সন্ধ্যা বেশ নেমে গেছে। আজ ক'দিন আকাশে চন্দ্র-সূর্যের দেখা নেই। জমাট অন্ধকার পৃথিবী ছেয়ে ফেলেছে। গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে চলেছি। রাস্তা নির্জন, জনমানবশূন্য! মাঝে মাঝে দু'একটি খামারের গাড়ী ছুটে চলেছে গৃহাভিমুখে। মাইল পোষ্ট দেখবার উপায় নেই, মাঝে মাঝে আন্দাজ করে সাইকেল হতে নেমে হাতড়ে বার করি ফার্লং পোষ্ট, দেখি আর ক'মাইল আছে বোড্‌মিন আর মাইলোমিটারে দেখি আজ ক'মাইল সাইকেল চালালাম। লিস্‌ফোর্ড ছাড়িয়ে মাইল চারেক এসেছি এমন সময় সামনে পড়ল দুটি পথ। একটি চলেছে সোজা ইংলিশ চ্যানেলে ৩৮৭নং রাস্তা ধরে আর অপরটি গেছে বোড্‌মিনে ৩০নং রাস্তায়। হিসাব করে দেখলাম বোড্‌মিন যেতে আর দু'ঘণ্টার

বেশী সময় লাগবে না। কিছুদূর যাবার পর শুনলাম পিছনে সাইকেলের বেলের আওয়াজ। অন্ধকার রাস্তায় বিনা আলোয় উর্ধ্বশ্বাসে সাইকেল চালিয়ে কে আসছে। কাছে এলে দেখি একজন সৈনিক। নিজেই যেচে জিজ্ঞাসা করলাম তার গন্তব্য-স্থান। আমার সাইকেলের আলোয় তার আব্‌ছা মুখটার চাহনি বুক কাঁপিয়ে দিল। যেন একটা বীভৎস মৃত্যুর প্রতিচ্ছবি, চাহনির মধ্যে রয়েছে এক দানবের ক্রুর উল্লাস। কাঁধে-ফেলা ঝোলাটায় একবার ঝাঁকানি দিয়ে বলল, আজ রাতেই আমাকে লণ্ডন যেতে হবে, যদি বোড্‌মিন যেতে চাও, তাহলে এস আমার সঙ্গে।

অবাক হয়ে গেলাম আজকের রাতের মধ্যে তার লণ্ডন যাওয়ার কথা শুনে। মানুষ কেন, স্বয়ং ভগবানকে সাইকেলে পাঠালে তিনিও পৌঁছতে পারবেন না। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এই রাতের মধ্যে তুমি লণ্ডন যাবে কি করে, সে তো প্রায় দেড়শ মাইল রাস্তা, তার ওপর তোমার শীতবস্ত্র নেই, আলো নেই! তুমি কি পাগল হয়েছ?

—দেখ, আমি মেসেনজার, আমার একটা কর্তব্যজ্ঞান আছে, তার ওপর কার জন্যে চিঠি বয়ে নিয়ে যাচ্ছি জান! উইনষ্টন চার্চিলের—যাঁর আঘাতে সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

অভিভূতের মত চললাম তার পিছু পিছু। পাল্লা দিয়ে চলতে পারিনে তার সঙ্গে। উর্ধ্বশ্বাসে শুয়ে পড়ে সমানে চালিয়ে

চলেছে সে উল্কার মত ঘণ্টায় আঠারো মাইল বেগে, পড়ে যাওয়ার ভয় যেন সে রাখে না। কিছুতে তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারিনে, আবার ছেড়েও দিতে পারিনে। আমি সাইকেলে পর্যটনকারী বাঙালী, সারা এশিয়ার বুকের ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে এসেছি, আর সামান্য একটা সৈনিকের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব না? রোখ এসে গেছে আমার, তুলে দিলাম স্পীড থার্ড গিয়ারে। সেও মাঝে মাঝে বলে চলেছে—এস, এস, আমায় আবার চার্চিলের কাছে চিঠি পৌঁছে দিতে হবে।

কতক্ষণ চালিয়েছি তা জানি না, মাথার টুপিটা কখন খসে পড়ে গেছে তাও খেয়াল করি নি। রেসের ঘোড়ার মত ছুটে চলেছি তার পিছু পিছু অনির্দিষ্টের সন্ধানে লক্ষ্যভ্রষ্টভাবে। যেন কে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে টেনে নিয়ে চলেছে।

তারপর কখন কি ঘটে গেল জানি না। জ্ঞান হলে দেখি শুয়ে রয়েছি এক ভদ্রলোকের ডেরায়। সারা শরীরে অসহ্য বেদনা, মাথায় হাতে পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। জানলাম, আমাকে রাস্তার ধারে খানায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকা অবস্থায় এঁরা তুলে নিয়ে এসেছেন চার্লস টাউনে অর্থাৎ লিস্‌ফোর্ড হতে চব্বিশ মাইল দূরে আর বোড্‌মিন হতে ষোল মাইল পূর্বে। তখনও সব কিছু ধাতস্থ করতে পারি নি, কি করে কি ঘটে গেল। সেটা স্বপ্ন না সত্য? কিন্তু স্বপ্ন হবে কেমন করে? আমার শরীরের এই আঘাতগুলো তো আর মিথ্যে নয়।

গৃহকর্তা মিঃ লিটন সব শুনে বললেন, আপনি আর্থার

ক্লিকেটের হাতে পড়েছিলেন। ও ছিল যুদ্ধকালে এ-আর-পির মেসেনজার, মিঃ চার্চিলের জন্যে একটা জরুরী চিঠি নিয়ে টেলিগ্রাফ অফিসে আসবার পথে ও গুলি খেয়ে মারা যায়। তারপরেই ওকে লোকে মাঝে মাঝে দেখতে পায় সাইকেল চালানো অবস্থায়।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকি এই অসম্ভাব্য ব্যাপার। মিশরের পিরামিডে, বেদুইনের দেশে, মরুভূমির বুকে রাত কাটিয়েছি দিনের পর দিন। ভয় ডর বলে কোন জিনিস মনে স্থান পায়নি কখনও, কিন্তু আজ যেন সব ঘটনা মিলে আমাকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে। সেই সাইকেল-চালানো মূর্তি তো আমি ভুলতে পারব না, অসম্ভব হলেও সে যে মস্ত বড় সত্যি।

সাপের বিষ

কিষণচাঁদ বর্মণ

ঘটনাটা বেশি দিনের নয়। ঘটেছিল সুন্দরবন অঞ্চলের কাক-দ্বীপের কাছাকাছি দূর্বাচটি নামে একটা জায়গায়। চারদিকে ধানের ক্ষেত, সবুজে সবুজ, এদিক ওদিকে ঝোপঝাপ, ঘন পাতলা জঙ্গল। ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে চলে গেছে সরু সরু 'আল'। আলের গায়ে অসংখ্য গর্ত। এই সব গর্তে অন্য ভয়াবহ সরীসৃপ ছাড়াও কাঁকড়া নামে লোভনীয় জান্তব প্রোটিন খাদ্য পাওয়া যায়। লাল লাল মোটা মোটা দাড়াওয়ালা বেশ বড়ো বড়ো কাঁকড়া। আশে পাশের গ্রামের চাষীরা কাঁকড়া

ধরে। কাঁকড়ার গর্তে হাত ঢুকিয়ে নির্বিবাদে ওদের টেনে বার করে আনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ওরা, কাঁকড়ার আড্ডা চিনতে তাই ওদের একটুও বেগ পেতে হয় না। কুঞ্জ ছুর্বাচটিরই এক চাষী। সেদিন সকাল থেকে একটা বড় গর্তে মোটা দাড়াওয়ালা কাঁকড়ার সন্ধান পেয়ে সে রীতিমত যুদ্ধ শুরু করেছিল। কুঞ্জর ধারণা কাঁকড়াটা বেশ বড়, ভালো শিকার হবে আজকের, তাই ওটাকে ধরার প্রবল জেদ চেপে বসেছিল তার। গর্তের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে কাঁকড়াটাকে ধরার অনেক চেষ্টা করল সে। এদিক থেকে সেদিকে, ওপাশে এপাশে কাঁকড়া ধরার জন্যে গর্তের ভেতরে যতবার তার হাত ঘোরে, কাঁকড়াটাও কামড় দিতে ছাড়ে না। কুঞ্জ বেশ জ্বালা অনুভব করে। কামড়ের চোটে রক্তও বেরিয়েছিল।

কুঞ্জকে কিন্তু কাঁকড়ার সঙ্গে যুদ্ধে সেদিন বিরতি দিতে হোল। কামড়ের চোটে নয়, কারণ কুঞ্জর কাছে এ সব নতুন কিছু নয়। তাকে সেদিনই ছুপুরের দিকে কোলকাতা রওনা হতে হবে বিশেষ কাজে। জমির ব্যাপার নিয়ে শহরের উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে আজই যেতে হবে বেলা বেশ গড়িয়ে গেছে তখন। কাঁকড়া ধরার ঝোঁকে অতটা খেয়াল করেনি সে। গর্ত থেকে হাত বার করে ক্ষতস্থানটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল কুঞ্জ। এদিক ওদিক থেকে এক গাদা শুকনো ঘাস জড়ো করে আনল তাড়াতাড়ি, নজরটা কিন্তু আড়চোখে সে কাঁকড়ার গর্তটার দিকেই ঠিক রেখেছিল। অমন লোভনীয় শিকারটাকে

হাতছাড়া করার তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। নেহাৎ জরুরী কাজে কোলকাতা যেতে হচ্ছে তাই, নইলে সে কি ছেড়ে দিত?

যাই হোক, শুকনো ঘাসগুলো দিয়ে বেশ করে চেপে চেপে গুঁজে সে গর্তের মুখটা বন্ধ করে দিল, কাঁকড়াটার পালাবার সব রাস্তাই বন্ধ। ঘাসের সেই শক্ত 'গোঁজা' খুলে গর্তে কারুর যাওয়া-আসা করার সাধ্য ছিল না। তাড়াতাড়ি কাঁধে গামছাটা ফেলে কুঞ্জ বাড়ির দিকে ছুটলো। ঘরে এসেই কুঞ্জ মালুকে ডাক দিল, মালু, এই মালু, শীগ্‌গির শোন এদিকে—

মালু কুঞ্জর ছোট ভাই। মাথায় তেল রগড়াতে রগড়াতে কুঞ্জ মালুকে বলল—দ্যাখ, ওই পূবদিকের ধানজমির ওই বাঁদিকের আলটার গায়ে একটা গর্তে দেখবি বেশ বড়ো 'গোঁজা' দিয়ে এসেছি। মোটা এক ব্যাটা কাঁকড়াকে আটক করেছি তাতে। কিছুতেই ধরতে পারলাম না, ব্যাটা কামড়ও বসিয়েছে বেশ, হাতটা টনটন করছে। তুই গিয়ে ওটাকে বার করবি। কোলকাতা আজ না গেলেই নয়, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—ভুলিস নি কিন্তু, আজই ওটার কিনারা করবি।

কুঞ্জ স্নান করে খেয়ে দেয়ে কোলকাতা রওনা হোল। মালু পরদিন সকালে উঠেই কাঁকড়ার গর্তে দাদার কথামত গিয়ে হাজির। ঘাসের 'গোঁজা' দিয়ে এমন আঁটভাবে গর্তটার মুখ বন্ধ যে, মালু সেটাকে খুলতে বেশ বেগ পেল। আস্তে আস্তে ঘাসের 'গোঁজাটা' আলগা হয়ে আসতেই সেটাকে জোরে টান

মেরে ফেলতে গিয়েই মালু সভয়ে চিৎকার করে ছিটকে এলো পাঁচ হাত দূরে। টান মারতেই ঘাসের গোঁজার সঙ্গে গর্ত থেকে প্রকাণ্ড একটা কালো কুচকুচে কেউটে বেরিয়ে এলো, জ্যান্ত নয়, মরা

প্রথম ভয়ের ঘোরটা কাটতেই মালুর সব ঘটনা একে একে মনে পড়ে গেল। কাঁকড়া ধরতে গিয়ে তাহলে দাদার হাতে এই কালসাপটাই ছোবল দিয়েছে, দাদা কাঁকড়া ধরার খেয়ালেই ছিল, সাপের কথা বোধ হয় মনেই হয়নি। তারপর ঘাসের গোঁজার চাপে সাপটার বেরুবার রাস্তা বন্ধ, গর্তের ভেতর দম আটকে মরেছে ঠিক। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে মালুর সারা শরীর শিউরে উঠলো, দাদা তাহলে এতক্ষণ বেঁচে আছে তো? পাগলের মত মালু সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়লো, তারপর সোজা কোলকাতা রওনা হোল তক্ষুনি। কোলকাতা পৌঁছে খোঁজ করে দাদার আস্তানা পাওয়া গেল, তবে দাদাকে সেখানে পাওয়া গেল না। সেখান থেকে কাজ সেরে কুঞ্জ নাকি সে দিনই দুপুরে কাকদ্বীপের দিকে গেছে। ওখানে ভালো করে সন্ধান নিয়েছিল মালু, সত্যিই তাহলে দাদা এখনো বেঁচে আছে! ধড়ে প্রাণ এলো মালুর। ক'টা দিন দাদার জন্যে তার চিন্তার শেষ নেই, আর যেন ঘোড়দৌড় করেছে সে। আবার কোলকাতা ছেড়ে কাকদ্বীপ আসতে হোল তাকে। কাকদ্বীপেই দাদার দেখা পেল মালু। মালুর সঙ্গে দেখা হতেই বেশ অবাক হয়ে গেল কুঞ্জ—কি রে তুই হঠাৎ এখানে?

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না।

—তোমার জন্যে যা ছোটাছুটি করেছি। কোলকাতায় গিয়ে তোমায় পেলাম না। ওরা বলল, এখানে এসেছ।

—কেন, কেন? বাড়ির খবর ভালো তো? কি ব্যাপার রে?

—বাড়ির খবর তো ভাল। তুমি কেমন আছ বলো দেখি?

—আমি তো ভালই আছি দেখতে পাচ্ছিস, কিন্তু আমাকে এত খোঁজাখুঁজি করছিস কেন, তাই বল্ না তাড়াতাড়ি।

—আচ্ছা দাদা, সেদিনের সেই কাঁকড়া ধরার কথাটা তোমার মনে আছে?

—সে তো এই গেল বুধবারের কথা, আজ চারদিন হোল, এর মধ্যে কি ভুলে যাব নাকি? কাঁকড়াটা ধরতে পারিস নি বুঝি, তার জন্যে তোকে সেই খবর দিতে এখানে আসতে হল? একটা আস্ত গাধা তুই···

—কিন্তু সেদিন যে তোমার হাতে অমন কামড় বসালো, তুমি কিছু টের পাওনি?

—টের পাইনি তো কি? বললুম তো তোকে, ব্যাটাকে ধরতেও পারলাম না আর কামড়েও দিল কষে।

—কিন্তু কাঁকড়ায় কামড়ায় নি মনে হয়···

—কাঁকড়া নয় তো কিসে, কি বলছিস রে?

—আমি তারপর দিন ঘাসের গোঁজা খুলে লাফিয়ে উঠলাম,

ভেতর থেকে টেনে বার করলাম প্রকাণ্ড একটা মরা কেউটে, গর্তটা কেউটেরই ছিল।

—অ্যাঁ, সে কি? কাতর একটা শব্দ বার হল কুঞ্জর গলা দিয়ে, মালুর কাঁধে ভর দিয়ে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল সে। মালুকে বলল—ত্থাখ, শরীরটা ভারী খারাপ লাগছে, কেমন যেন সব অন্ধকার হয়ে আসছে, সাপেই বোধ হয় কামড়েছিল রে, অতটা বুঝিনি, আমায় ধরে তাড়াতাড়ি একটু শুইয়ে দে—

মালু হঠাৎ এরকম ব্যাপারের জন্যে তৈরি ছিল না, বয়স তার বেশি নয়, দাদাকে এভাবে নেতিয়ে পড়তে দেখে সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। কুঞ্জকে আস্তে আস্তে ধরে সেখানে শুইয়ে দিতেই সাপে কামড়ানোর যাবতীয় লক্ষণগুলি কুঞ্জর দেহে একে একে প্রকাশ পেল, মুখে দেখা দিল গ্যাঁজলা, গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে এল, মাথাটা ঝুঁকে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কুঞ্জ মারা গেল।

●

[কাহিনীটি যখন 'যুগান্তরে' প্রকাশিত হয়, তখন এই প্রসঙ্গে পাঠকজনের কাছ থেকে অনেক অনুসন্ধিৎসু চিঠিপত্র এবং সুচিন্তিত মতামত এসেছিল। এইরকম একখানি চিঠি এবং তদুত্তরে যুগান্তর সাময়িকী-সম্পাদকের মন্তব্য তুলে দেওয়া হল। এই মন্তব্যের সমর্থনে সাময়িকী-সম্পাদক যে 'হাইজিয়া'

পত্রিকার কাহিনী পরিবেশন করেছেন পাঠকজনের কাছে সেটুকুও বিশেষ মর্মগ্রাহী হবে বলে বিশ্বাস।

গত ২৮শে অক্টোবর সাময়িকীতে 'সাপের বিষ' শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে লেখক যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই। আমার প্রশ্ন হইল, কুঞ্জবাবুর মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে। সর্পের বিষই কি তাঁহার মৃত্যুর কারণ অথবা অন্য কোন কারণে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে? আমার মনে হয়, প্রথমোক্ত কারণে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই যাহাকে কাল কেউটে দংশন করে, সে কখনও তিন চারি দিন জীবিত থাকিতে পারে না। দংশনের সঙ্গে সঙ্গেই বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং শীঘ্রই দেহ বিষে জর্জরিত হইয়া পড়ে। কুঞ্জবাবুকে ঐ সর্প দংশন করিয়াছিল বটে কিন্তু গর্তের মধ্যে যখন তিনি হস্ত প্রবেশ করাইয়াছিলেন তৎকালে সর্প তাঁহার হস্তে যে দংশন করিয়াছিল, তাহা হাঁ করিয়া চাপিয়া ধরার ন্যায়। সর্প যখন প্রকৃত মারাত্মকভাবে দংশন করে, তখন মস্তক উচ্চ করিয়া দংশন করে ও মুখ কিঞ্চিত বক্র করে যাহাতে কষের দন্তের বিষ দষ্ট শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু কুঞ্জবাবুর ক্ষেত্রে সর্প সেরূপ সুযোগ পায় নাই এবং প্রকৃত দংশন হয় নাই। সেই জন্যই তিনি কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে সুস্থ শরীরে গমন করিয়াছিলেন। আবদ্ধ গর্তের মধ্যে সর্পের মৃত্যু হইয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু কুঞ্জবাবুর মৃত্যু সর্প বিষে নয়। কালকেউটে তাঁহাকে দংশন করিয়াছে জানিবামাত্র তিনি এরূপ

ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার হৃৎক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবার মত হইল। অত্যধিক ভীত হইলে মানুষের যেরূপ হয় বা অত্যধিক আনন্দিত হইলে যাহা ঘটিতে পারে, তাঁহারও ঠিক তাহাই হইয়াছিল এবং ফলে তাঁহার দেহ ক্রমশঃ অবশ হইতে লাগিল এবং পরিশেষে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই ঘটনাটি ব্যাখ্যার আওতার বাহিরে বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীশিবচন্দ্র নাথ

সাময়িকী-সম্পাদকের মন্তব্য

সর্প দংশন প্রকৃতই হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে ঐ প্রবন্ধে, কিন্তু পরবর্তী ভয়জনিত লক্ষণাদি প্রকাশ সম্বন্ধে নাই। এরূপ বহু ঘটনার রেকর্ড আছে। শিকাগো হইতে প্রকাশিত 'হাইজিয়া' (বর্তমান টুডেজ হেলথ) নামক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিখ্যাত পত্রিকায় নিম্ন-উদ্ধৃত ঘটনাটি ছাপা হইয়াছে। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'অটো সাজেস্‌শন।' একথা সবারই জানা যে, বিষের ভয়ে বিষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, কলেরার ভয়ে কলেরা হয়। ইহা হয় মাত্র, কিন্তু কেন হয় তাহার কি কোনো ব্যাখ্যা হয়? নাম দেওয়া হইয়াছে 'অটো সাজেস্‌শন'—কিন্তু ইহা ব্যাখ্যা নহে। কোনো বুদ্ধিতে ইহার ব্যাখ্যা এখনও হয় নাই।

হাইজিয়া পত্রিকার কাহিনী

এক ভদ্রমহিলা তাঁর বাড়িতে তিনজন বন্ধুকে ব্রীজ খেলার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বন্ধুদের খাওয়াবার জন্য তিনি বড় এক থালা স্যামন্-স্যাণ্ডউইচ তৈরি করেছিলেন। ভদ্রমহিলা স্যাণ্ডউইচ আনতে রান্নাঘরে গিয়ে দেখলেন তাঁর বিড়ালটি সেই খাবারে মুখ দিয়ে ঠোকরাচ্ছে। বিড়ালের কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি তো ভারী রেগে গেলেন এবং বিড়ালটিকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। দু' তিনটি স্যাণ্ডউইচে বিড়ালের দাঁতের দাগ পড়েছিল, সেগুলো তিনি বাতিল করে দিয়ে বাকিগুলো এনে অতিথিদের পরিবেশন করলেন। সকলে খাবারের খুব তারিফ করলেন। আধ ঘণ্টাখানেক পরে ভদ্রমহিলা আবার কি দরকারে রান্নাঘরে গিয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন, দেখেন বিড়ালটা বাড়ির পিছনের দরজার কাছে মরে পড়ে আছে। ভদ্রমহিলা ভাবলেন, 'সততাই শ্রেষ্ঠ উপায়', সুতরাং অতিথিদের কাছে কিছু গোপন না করে সকলকে ব্যাপারটা আগাগোড়া খুলে বললেন। প্রায় বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনজন মহিলার দেহে বিষাক্ত খাদ্য গ্রহণের যাবতীয় ভয়ঙ্কর লক্ষণ প্রকাশ পেল। ওঁদের দেহ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, পেটে হাত টিপে যন্ত্রণায় সকলে গোঙাতে লাগলেন। ভদ্রমহিলা দেখলেন মহাবিপদ, তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর ডাক্তারকে 'ফোন' করে দিলেন। ডাক্তার তক্ষুনি ঘটনাস্থলে এসে হাজির, 'ষ্টমাক-পাম্প' দিয়ে তাড়াতাড়ি পেট পরিষ্কার করে ওঁদের সকলকে নির্জীব অবস্থায় গাড়ি করে

বাড়ি পৌঁছে দিলেন। ওঁরা যেই মাত্র গেছেন, তক্ষুনি দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল। ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দেখেন পাশের বাড়ির ভদ্রলোক। ভদ্রলোক ওঁকে দেখেই সবিনয়ে বললেন, —'দেখুন, ভারি দুঃখিত আমি। গাড়িখানাকে আমার 'গেরাজে' নিয়ে যাচ্ছিলাম এমন সময় কোত্থেকে আপনার বিড়ালটা ছুটে এসে আমার গাড়িটার চাকার নিচে পড়েই তক্ষুনি মারা গেল। তখন বাড়িতে দেখলাম আপনার অতিথিরা রয়েছেন, তাই কিছু বলি নি, বিড়ালের মরা দেহটা পিছনের দিকের দরজার গোড়ায় রেখে এসেছিলাম।'

প্রেত মুহূর্ত

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

একটু ভূমিকা দরকার। যে কাহিনী এখানে বলতে চলেছি, সে কাহিনীর রচয়িতা আমি নই। সে কাহিনী লিখেছেন, মানব-অস্তিত্বের মহা-রহস্যকে যিনি নিজের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে বিজ্ঞানের আঙ্কিক সূত্রে গেঁথে গিয়েছেন, ইন্দ্রিয়ের অগোচর মহাদেশের সমুদ্র-পর্বত-প্রান্তরকে মহাদুঃসাহসিক সাধনায় যিনি আবিষ্কার করে গিয়েছেন, আবিষ্কার করে গিয়েছেন যিনি পদচিহ্নহীন মানব-মনের মেরুঅঞ্চল, এ কাহিনী লিখে রেখে

গিয়েছেন জীবনতত্ত্বের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, শ্রীঅরবিন্দ। সাধারণত আমরা শ্রীঅরবিন্দকে জানি রাজনীতির গুরুরূপে, ধর্মগুরুরূপে। কিন্তু তিনি তারও অতিরিক্ত কিছু। তিনি বর্তমান ভারতের সাহিত্যগুরু। এক যুগ পরে হোক, দশ যুগ পরে হোক, সমগ্র সাহিত্য-জগৎ একদিন সবিস্ময়ে আবিষ্কার করবে, মানুষকে দিব্যজীবনের দীক্ষা যিনি দিয়ে গিয়েছেন, তিনি দিয়ে গিয়েছেন সেই দিব্যজীবনের আধার স্বরূপ এক দিব্য-সাহিত্যিকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে স্তব করে বলেছিলেন তুমি ভারতের বাণী-রূপ। এই বিশেষণ কবির কল্পনার অলঙ্কার নয়, রবীন্দ্রনাথের অভ্রান্ত কবি-মানসের সত্য দৃষ্টি। আজকের যুগের শিক্ষিত তরুণেরা, যাঁরা ধর্মের আফিঙ খেতে চান না, তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যেই এই কথা এখানে বলছি, সাহিত্য সম্বন্ধে যদি তাঁদের সত্যকারের প্রীতি থাকে, তাহলে যেন তাঁরা শ্রীঅরবিন্দের বিরাট রচনাকে সাহিত্যরূপেই অনুশীলন করতে চেষ্টা করেন। এইপ্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম এই জন্যে যে, গত ষাট সত্তর বছরের মধ্যে, এই বাংলাদেশের চারজন বাঙালী একই সময়ের আয়তনের মধ্যে বিশ্ব-চেতনার ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন, সাহিত্য ধর্মের যে দিব্য প্রকাশকে রূপ দিয়ে গিয়েছেন, তার সম্বন্ধেও মূল্য নির্ণয় করবার কোন চেষ্টাই আমাদের জাগে নি। সেই চারজন বাঙালী বাণী-গুরু হলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ।

শ্রীঅরবিন্দ এক দিন কতকগুলি গল্প লেখার পরিকল্পনা করেন। সেই গল্পগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে, 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না', প্রসঙ্গের পরমাত্মীয়তা দেখা যায়। জীবনের যে-সব ঘটনাকে আমরা দুর্জ্ঞেয় বলে mystic বা occult নাম দিয়ে সরিয়ে রাখি, শ্রীঅরবিন্দ সেই জাতীয় ঘটনা নিয়ে কতকগুলি ছোট গল্প লেখার পরিকল্পনা করেন। দুঃখের বিষয় তিনি এই পরিকল্পনায় মাত্র একটি ছোট গল্প লিখেছিলেন। তার নাম, The Phantom Hour, প্রেত-মুহূর্ত। সম্পূর্ণ নতুন ও একান্ত দুরূহ এই বিষয় নিয়ে তিনি ছোট গল্প লিখতে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হন নি যে, তিনি ছোট গল্পই লিখেছেন এবং এই একটি ছোট-গল্পের আঙ্গিকের দিক থেকে জগতের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের মহিমা অর্জন করেছে। আমি সেই গল্পের কাহিনীটুকুই এখানে পরিবেশন করছি,—মূল গল্পের বিস্ময়কর ভাষা, ভঙ্গি ও পরিবেশ অনুবাদের অতীত। যদিও এটা কাহিনী কিন্তু কাহিনীর আড়ালে শ্রীঅরবিন্দ মানবজীবনের এক সম্ভাব্য ঘটনাকেই রূপ দিয়েছেন, প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কাহিনীর মতন এই কাহিনীর মূলও জীবন-সত্যের রস থেকে শক্তি পেয়েছে, তাই একান্ত বাস্তব।

কাহিনী

স্টার্জ মেনার্ড হাতের বইটা রেখে দিয়ে জানলার কাছে উঠে

এল···খোলা জানলা দিয়ে বাইরে চাইতেই চোখে পড়ল, লণ্ডনের ঘন কালো কুয়াশা, পুরু হয়ে পথ-ঘাট বাড়িঘর-দোর সমস্ত ঢেকে ফেলেছে। কুয়াশা থাকেই, কিন্তু এমন ঘন হয়ে ক্বচিৎ থাকে। মেনার্ডের মনে হল, হয়তো তার দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে কারণ এই মাত্র জার্মাণ-মিষ্টিকের লেখা রহস্য-তত্ত্বের যে বইখানা সে পড়ছিল, তার ধেঁায়াটে আবহাওয়ায় মন হাঁপিয়ে উঠছিল বলেই সে জানলায় উঠে আসে, হয়ত জমাট-বাঁধা সেই মনের ধেঁায়া বাইরের কুয়াশাকে আরো ধেঁায়াটে করে তুলেছে।

বাইরের সেই ঘন কুয়াশা যেন মেনার্ডের দৃষ্টিকে অদৃশ্য কোন উপায়ে আটকে রাখে। মেনার্ড চোখ ফেরাতে পারে না। মনের মধ্যে চলতে থাকে সেই জার্মাণ মিষ্টিকের লেখার প্রভাব। ধ্যানের গভীরতার মধ্যে মানুষ যে আলোক-রেখার দর্শন পায়, জার্মাণ মিষ্টিক তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, সে আলো কাল্পনিক নয়, বাইরের বস্তু-জগতের আলোর মতনই তা সত্য ও বাস্তব। মেনার্ডের সমস্ত মনকে আলোড়িত করে বারবার শুধু একই প্রশ্ন জাগে, তা কি করে সম্ভব? বাইরের সেই নীরন্ধ্র ঘন কুয়াশার মতন সেই প্রশ্ন মেনার্ডের সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মেনার্ড যে কতক্ষণ সেই অবস্থায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার কোন ধারণাই ছিল না। হঠাৎ মনে হলো, মাথার ভেতরে যেখানে মস্তিষ্ক থাকে, সেখানেই যেন বিচিত্র এক স্পন্দন জেগে উঠল; তার সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত

চেতনা যেন চোখের পর্দার আড়ালে ঘন হয়ে জড়ো হল··· স্থিরবদ্ধ শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের কুয়াশার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সে স্পষ্ট দেখল, কালো কুয়াশার বুকে বিদ্যুৎ ঝলকের মতন ক্ষণে ক্ষণে ঝলসে উঠল রক্তাভ আলোক-রেখা। সমস্ত স্নায়ু, শিরা-উপশিরা অকস্মাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে সে উত্তেজনার কোন স্পন্দনই নেই। মস্তিষ্ক যেন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থেকে সেই অকস্মাৎ আলোড়নকে লক্ষ্য ক'রে চলেছে। সেই আকস্মিক আলোক-রেখা অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু মেনার্ড স্পষ্ট যেন বুঝতে পারে, সামনের কুয়াশার বুকে কে যেন আলোক-রেখা দিয়ে কি-একটা এঁকে তুলতে চেষ্টা করছে, রেখাপাত করছে আবার মুছে ফেলছে··· এখনি যেন সম্পূর্ণ একটা রেখা-চিত্র ফুটে উঠবে···মেনার্ড সমস্ত দৃষ্টি সংহত করে সেই দিকে চেয়ে থাকে, যেন তার উৎসুক দৃষ্টি দিয়ে সে সেই অদৃশ্য চিত্রকরকে অনুপ্রাণিত করে তুলবে। তার ব্যাকুল বাসনা ধীরে ধীরে কুয়াশার বুকে সত্য হয়ে উঠতে থাকে। একটা আবছা আলো···ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে··· উজ্জ্বল হয়ে ওঠে···জ্যামিতির বৃত্তের মতন গোল হয়ে ওঠে...ঐ আলোর বৃত্তের ভেতর অস্পষ্ট ওটা কি? কোন মানুষের মুখ? না অন্য কোন জিনিসের রূপ-রেখা? মেনার্ড সমস্ত মন দিয়ে চেয়ে থাকে, আলোক-বৃত্তের ভেতর ধীরে ধীরে স্পষ্ট মূর্তি ধরে প্রকাশিত হল, কোন রোমান্টিক বস্তু নয়, স্রেফ্ একটা ঘড়ি। কি মনে করে মেনার্ড ঘরের ভেতর নিজের ঘড়ির দিকে ফিরে

চায়, সেই পরিচিত ঘড়ি তেমনি টাঙানো রয়েছে, পেণ্ডুলামটা দুলছে···মেনার্ড লক্ষ্য ক'রে দেখে, ঘড়িতে এখনি পাঁচটা বাজবে। ঐ ঘড়িরই ছায়া কি সামনে সে দেখেছে? মেনার্ড বাইরে কুয়াশার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে আবার চায়, না তার ঘড়ির ছায়া নয়, সম্পূর্ণ আলাদা গড়ন···কালো এবনি দিয়ে ঘেরা, এবনির মত কালো সারা অঙ্গ···তার ওপর রূপালী আঁচড়ে ঘণ্টার আঁক কাটা···মেনার্ড ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে, তার ঘরের আসল ঘড়িতে ঠিক যেমন পাঁচটা বাজছে, বাইরের সেই অবাস্তব ছায়া-ঘড়িতে ঠিক তেমনি কাঁটায় কাঁটায় আটটা বাজছে। হঠাৎ নজর পড়ল, চারটের ঘরে···সেখানে সাধারণ ঘড়ির মতন রোমান পদ্ধতিতে চার আঁকা নেই···তার বদলে পাশাপাশি শুধু চারটে রূপালী দাঁড়ি। নিশ্চয় সেই জার্মাণ মিষ্টিকের বই তার মস্তিষ্ককে উত্তপ্ত করে তুলেছে, যার ফলে এই অপরাহ্ণ আলোকে সে মরীচিকা দেখছে। উত্তপ্ত মস্তিষ্কের ভোজবাজী ছাড়া সামনের ঐ ঘড়ি আর কি হতে পারে? নিশ্চয়ই অতীত জীবনে কোন এক সময় ঐ ঘড়ি কোন পরিচিত বন্ধু বা আত্মীয়ের বাড়িতে সে দেখে থাকবে, তার অগোচরে মনের সংগোপন স্তরে লুকিয়ে ছিল তার স্মৃতি-ছবি, আজ উত্তপ্ত মস্তিষ্কের প্রভাবে চোখ সেই স্মৃতিকেই প্রতিফলিত করে দেখছে···কিন্তু এর আগে কোথায় সে দেখেছে এ ঘড়িকে মনে করতে চেষ্টা করে, যত চেষ্টা করে তত মনে হয় ঐ কালো-এবনি-মোড়া-ঘড়ি নিশ্চয়ই তার বিশেষ পরিচিত, কিন্তু কোথায়, কোথায় দেখেছে?

মনের মধ্যে কোথায় একটা ছোট্ট পাঁচিলে ধাক্কা লেগে ফিরে ফিরে আসে তার দৃষ্টি, কিছুতেই সেই পাঁচিলটুকু টপ্‌কে যেতে পারে না।

ঠিক সেই সময় তার ঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বেজে উঠলো, অন্যমনস্কভাবে সে ঘণ্টার আওয়াজ গুণতে থাকে··· পাঁচটার ঘণ্টার আওয়াজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার কানে এলো, অন্য কোথাও আর একটি ঘড়ি বাজছে···খুব স্পষ্ট নয়, কিন্তু স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে, ঘণ্টার আওয়াজটা সুরে বাঁধা··· প্রত্যেক ঘণ্টার আওয়াজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোট্ট মধুর সুরের রেশ গড়িয়ে যাচ্ছে...সে গোণে, একটা···দুটো তিনটে....আটটা···আটটা বেজে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কি ব্যাপার? 'এই দ্বিতীয় ঘড়ির আওয়াজ কোথা থেকে এলো? নিশ্চয়ই, এটা হিপ্‌নটিজিমের কোন রকম-ফের! মনে পড়লো, এই মাত্র যে বই পড়তে পড়তে সে উঠে এসেছে, তাতে এই জাতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা ছিল। সে কি নিজেকেই নিজে হিপ্‌নটাইজ করেছে? তাড়াতাড়ি বইটা খুলতেই তার চোখে পড়লো, গ্রীক ভাষায় লেখা একটা কবিতা। লেখক উদ্ধৃত করে দিয়েছে:

'স্বর্গের অমর দেবতারা আমাদের পৃথিবীর কাছাকাছিই ঘোরাফেরা করেন, অনেক সময় তাঁরা এই পৃথিবীর মানুষের ভিড়ের মধ্যেই থাকেন, মানুষ কোন সন্ধানই পায় না। ক্বচিৎ কখনো এমন এক-আধটি মানুষ দেখা যায়, যিনি এই মর্ত চোখ

দিয়েই চিনতে পারেন মানুষের ভিড়ে আগন্তুক দেবতাকে যাঁর মনে ছদ্মবেশের আড়ালে ধরা পড়ে আসল দেবতার স্বরূপ…’

মেনার্ড বলে ওঠে—স্রেফ কবিতা…গ্রীক কবি-মনের কল্পনা …হিপ্‌নটিজিমের কাব্যিক প্রকাশ !

কবিতাটা সেইখানেই শেষ হয়নি। মেনার্ড তার পরের অংশটাও পড়ে—‘এই পৃথিবীর সূর্যালোকে, হায়, মানুষও ঘুরে বেড়ায় ছদ্মবেশে · জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একবারও সে দেখতে পায় না সেই ছদ্মবেশের আড়ালে কে আছে, দেবতা না দানব ?’

বই বন্ধ করে মেনার্ড আবার খোলা জানালায় এসে দাঁড়ায়। হিপ্‌নটিজিম্ হোক, আর উত্তপ্ত মস্তিষ্কের বিকারই হোক, মেনার্ড স্পষ্ট বুঝতে পারে, এই বিচিত্র মুহূর্তে তার জীবনের গভীরতায় কোথাও মহা-পরিবর্তনের বীজ যেন মাথা তুলে জাগছে…তার সমস্ত চেতনায় তার ছায়া এসে পড়েছে। মেনার্ড অভিভূত হয়ে পড়ে—অনির্দিষ্ট বেদনায় তার সমস্ত শিরা উপশিরা টন্‌টন্ করতে থাকে—এমন সময় সামনের সেই জমাট পাঁশুটে কুয়াশার ভেতর থেকে আবার বেজে ওঠে সেই ঘড়ির ঘণ্টার আওয়াজ…আটটা বাজছে…মেনার্ড কান পেতে শোনে …কিন্তু এবার ঘড়ির সেই সুরেলা আওয়াজের পেছন থেকে আসে নারীকণ্ঠে মথিত আর্তনাদ…আর্ত অসহায় কোন নারী যেন কাতরভাবে তাকে ডাকছে। মেনার্ড মনে মনে ভাবে, একি তার এই জীবনেরই কোন অতীত ঘটনার স্মৃতির প্রতি-

স্বপন? না, দূর জন্মান্তরের কোন ঘটনা, তার চেতনার অগোচরে জন্ম-মৃত্যু-পারাপারের বেড়া ডিঙিয়ে সংগোপনে তার মনের অন্ধকারে ছিল লুকিয়ে, আজ কোন বিচিত্র নিগূঢ় কারণে মরীচিকার রূপে এসেছে ইন্দ্রিয় সীমানার মধ্যে? এমন সময় আটটার ঘণ্টা শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে, মেনার্ডের মনে হল, খুব দূরে কোথাও যেন একটা রিভলাভরের আওয়াজ হল···

মেনার্ড আর সহ্য করতে পারে না। সেই হিপ্‌নটিক্ কুহক ভাঙবার জন্যে সে জানলা থেকে জোর করে নিজেকে সরিয়ে নিলো। কোথায় যাবে. কি করবে, তা ঠিক করে উঠতে পারে না। শুধু একটা কথাই তখন মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা হোক একটা কিছু করতে হবে। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে ···কয়েক পা যেতে না যেতেই হঠাৎ তার মনে পড়ল, রিভলভারটা শোবার ঘরে আলগা পড়ে আছে। কোন কিছু না ভেবেই সে ছুটে শোবার ঘরে আসে, তাড়াতাড়ি রিভলভারটা তুলে নেয়। কোথায় রাখবে? পরে তুলে রাখলেই হবে, এখন তাড়াতাড়ি সেটা পকেটে ফেলে নেয়। একবার শুধু দেখে নেয়, সেটা ভর্তি, না খালি···দেখে ভর্তিই আছে···সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে পড়ে। লণ্ডনের অপরাহ্ণের সেই ঘন কুয়াশায় পথঘাট লোকজন সব যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এমন ঘন গাঢ় কুয়াশা মেনার্ড জীবনে আর কোনদিন দেখেনি। তার মগজের ভেতরে যে কুয়াশা জমাট বেঁধে নেমেছিলো, মনে হলো তার ভেতর দিয়েই যেন সে চলেছে···কোথায় চলেছে,

কেন চলেছে, কিছুই সে ভেবে ঠিক করতে পারে না; শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারে, সেই ঘন কুয়াশার মধ্যে কে যেন তাকে টেনে নিয়ে চলেছে···কুয়াশার মধ্যেই যেন সে কোথাও লুকিয়ে আছে।

এদিক-ওদিক যেতে হঠাৎ সে দেখে, একটা অতি-পরিচিত রাস্তা ধরে সে এগিয়ে চলেছে···এই রাস্তা দিয়েই সে প্রতিদিন রেণীর কাছে যায়।

ভেতরের আর বাইরের সেই ঘন আঁধির মধ্যে জ্যোতি-র্শিখার মতন জ্বলে উঠলো রেণীর অপরূপ সত্তা...রেণী, তার জীবনের জ্যোতির্শিখা···বহু সাধ্য সাধনায় বহু বিরূপতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে রেণীকে জয় ক'রে নিতে হয়েছে তাকে··· যদিও সে জয়-গৌরব এখনো পায়নি সামাজিক স্বীকৃতি।

রেণীর বাড়ির কাছাকাছি রাস্তার মোড়ে পা দিতেই মেনার্ডের মনে পড়লো, কাল যখন সে রেণীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসে, বিদায়ের মুহূর্তে হাত চেপে ধরে রেণী বলেছিল, শুধু একটা দিন···আজকের দিনটা যেন আমি তার সঙ্গে দেখা করতে তার বাড়িতে না আসি।

মেনার্ডের মনে পড়লো, সেইটুকু অনুরোধ করতে গিয়ে রেণীর হাতের আঙুলগুলো যেন কেঁপে উঠেছিল, চোখেমুখে এমন একটা স্থির গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছিল, যার একমাত্র অর্থ হলো, এর বেশি আর কিছু জানতে চেয়ো না, আর কোন প্রশ্ন করো না! রেণীর সম্বন্ধে, রেণীর ভালবাসা সম্বন্ধে মেনার্ডের মনে প্রশ্ন

করবার কিছুই ছিল না। যেদিন সে রেণীর সঙ্গে পরিচিত হয়, সেদিনই সে জেনেছিল, এ-নারী সাধারণী নয়, অতীত জীবনের সরোবর থেকে সে ফুটে উঠেছে শতদল...তার জীবনের মৃণাল মূল পড়ে আছে প্রচণ্ড এক অতীতের গভীরতায়... কিন্তু তার সত্তা সেই অতীতকে মুছে ফেলে সামনের দিকে শতদল মেলে ধরেছে। মেনার্ড কোনদিন সে অতীতকে জানতে চায় নি, জানবার কোন প্রয়োজনই হয়নি। মেনার্ড সূর্যোদয়ের মতনই রেণীর আবির্ভাবকে সহজে গ্রহণ করেছিল...আজকের প্রভাতের অরুণোদয়ের বিস্ময়ের সঙ্গে গতদিনের সূর্যোদয়ের কি সম্পর্ক? তাই কাল যখন রেণী বিদায়ের মুহূর্তে মিনতি করেছিল, আজকে না আসতে, মেনার্ড কোন প্রশ্ন করেনি...সেই মিনতির মধ্যে যে অস্বাভাবিক কিছু ছিল তা তার মন হয়ত লক্ষ্য করেছিল কিন্তু তার বেশি আর কোন মূল্য দিতে পারেনি।

রেণীর বাড়ির সামনে যে পার্কটা ছিল, মেনার্ড দেখে সেই পার্ক পেরিয়ে বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে...বাড়িতে ঢোকবার একটা আলাদা দরজা ছিল, তার চাবি মেনার্ডের কাছেই থাকতো...পকেটে হাত দিয়ে দেখলো, রিভলভারের তলাতেই চাবিটা রয়েছে। চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। হ্যাট-টা রেখে দিয়ে বসবার ঘরের দিকে এগিয়ে চললো। খোলা দরজা দিয়ে মেনার্ড দেখতে পেলো, রেণী দু'হাত দিয়ে চেয়ারের হাতল চেপে ধরে বসে আছে। পায়ের শব্দে সে চমকে উঠে দাঁড়ালো...পাথরের মতন কঠিন মুখে

দুটো চোখ যেন দপ্ করে জ্বলে উঠলো। মেনার্ডকে ঢুকতে দেখে, সে-আগুন তেমনি হঠাৎ নিভে গেল। সমস্ত শরীর যেন এক নিমেষে এ লয়ে চেয়ারে পড়ে গেল। মেনার্ড আবিষ্টের মতন সেই অপরূপ নারীমূর্তির দিকে চেয়ে থাকে···পরিপূর্ণ সুগঠিত দেহ···ভরা নদীর মতন প্রত্যেকটি অঙ্গ রসের উচ্ছলতায় নিটোল হয়ে উঠেছে···ফ্রান্সের জল, মাটি, হাওয়া আর আঙুর পাকানো সূর্যের আলো চোখে, মুখে, দেহের রেখায় রেখায় জ্বালিয়ে রেখেছে প্রাণের দীপ্তি···স্থিরা বিদ্যুৎ···ভিক্ষুণীর মত নয়, রাণীর মত, যে রূপ অনায়াসে দাবী করে পুরুষের সর্বস্ব।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অস্বাভাবিক কণ্ঠে রেণী বলে ওঠে, ষ্টার্জ ! তুমি !

মেনার্ড এগিয়ে তার হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলে, তোমার নিষেধ ভুলেই গিয়েছিলাম···বাড়ির কাছাকাছি এসে মনে পড়ল, তুমি আজ আসতে বারণ করেছিলে···ফিরে যাওয়া মানে, বাইরে দেখছ কি রকম কুয়াশা জমাট বেঁধেছে আজ··· আর সামনে দুপা এগিয়ে আসা মানে ··তুমি ! ফিরে যেতে পারলাম না রেণী !

রেণীর মুখে ফুটে ওঠে হাসি···আনন্দেরই। মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলে, ভুলে যাওয়া কিন্তু উচিত হয়নি। তোমাকে এখুনি ফিরে যেতে হবে···মানে, এখুনি নয়···এই ধর, পনেরো মিনিট পরে···পনেরো মিনিটের বেশি তুমি এখানে আর থাকতে পারবে না।

এই বলে রেণী ঘাড় ফিরিয়ে দেয়ালের ঘড়ির দিকে চাইল। মেনার্ড ও আপনা থেকে রেণীর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে ঘড়ির দিকে চোখ তুলে দেখল···কি আশ্চর্য, এই কিছুক্ষণ আগে তার নিজের ঘরের জানালা থেকে কুয়াশার বুকে যে ছায়া-ঘড়ি সে দেখেছিল···কালো এবনি দিয়ে মোড়া, কালো-এবনির দেহ, তার ওপর রূপালী আঁচড়ে ঘণ্টার ঘর আঁকা। মেনার্ড ভাল করে দেখে, চারটের ঘরে সেই অস্বাভাবিক চিহ্ন, রোমান সংখ্যা লিপি নয়, পাশাপাশি চারটে রূপালী আঁচড়! মেনার্ড মনে মনে আশ্বস্ত হয়, রেণীর ঘরের এই পরিচিত ঘড়িরই মানসিক প্রতি-ফলন সে উত্তপ্ত মস্তিষ্কে দেখেছে!

মেনার্ড বলে, বেশ, তোমার কথার অবাধ্য হবো না···আমি আইমোজেনের বাড়িতে চললুম।

আইমোজেন মেনার্ডের সম্পর্কে ভগ্নী।

রেণী একবার মেনার্ডের দিকে চায় আর একবার দেয়ালের ঘড়ির দিকে চায়। তার মুখ আবার যেন কঠিন হয়ে উঠতে থাকে। মেনার্ডের হাত ধরে বলে, কিন্তু, শোন, তুমি আবার ফিরে আসবে—আট-টার সময়, কেমন? তুমি এলে, তুমি আর আমি একসঙ্গে খেতে বসবো—মনে থাকে, আট-টার সময়···

আটটার সময়! মেনার্ডের মনে পড়ে, কুয়াশার ঘড়িতে সে দেখেছিল, আটটা বাজছে···স্পষ্ট শুনেছে আটবার ঘণ্টার আওয়াজ। মেনার্ড কথা বলতে চেষ্টা করে, কিন্তু মনে হয় নিরর্থক। কিছুক্ষণ পরেই যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়, বেশ,

এখন তা হলে চললাম, আটটার সময়ই ফিরে আসছি।

—হ্যাঁ, ভুলো না—খাবার নিয়ে আমি বসে থাকবো....

রেণী আলিঙ্গন করে—কিন্তু মেনার্ড যেন গ্রহণ করে না। তার কানে তখন বাজছে, সেই কুয়াশার ঘড়ির ঘণ্টার আওয়াজ।

আবিষ্টের মতন মেনার্ড বেরিয়ে আসে। কাছেই আইমোজেনদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে, কথা যা বলবার আইমোজেনই বলে, মেনার্ড শুধু শুনে যায়। সেদিনকার খবরাখবর, থিয়েটার, সিনেমা, এই সবের গল্প। কিছুক্ষণ পরে আইমোজেন বলে ওঠে, আমার নেমন্তন্ন আছে বেরুতে হবে, আটটা বাজতে আর মাত্র দশ মিনিট বাকি—তুমি কি থাকবে?

আবিষ্টের মতন মেনার্ড উঠে দাঁড়ায়, বলে, না, আমারও নেমন্তন্ন আছে, আটটার সময়!

অভ্যাসবশতঃ মেনার্ড হাতের ঘড়িটা দেখে, আট-টা বাজতে আর দশ মিনিট বাকি। বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায় অন্ধকারে কুয়াশা আরো ঘন হয়ে উঠেছে। পাশের লোককে দেখা যায় না। কিছুই দেখা যায় না। মেনার্ড তাড়াতাড়ি হাঁটে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। এ কিসের আওয়াজ? তার পায়ের আওয়াজ, না তার বুকের স্পন্দনের আওয়াজ? কোথায় চলেছে সে? ঠিক পথ দিয়ে যাচ্ছে তো? সে যাচ্ছে, না তাকে কেউ নিয়ে চলেছে? কে নিয়ে যাবে? মেনার্ডের বুকের ভেতর অস্বাভাবিক দ্রুত তালে স্পন্দন হতে থাকে। বিকেল থেকে সমস্ত ব্যাপারটা যেন একটা চক্রান্তের মতন মনে হয়, যে চক্রান্তে তার অংশ

আছে, অথচ কোন দায়িত্ব নেই। কার এ চক্রান্ত ? চক্রান্তই যদি হয়, তবে কি সে নিজের চেষ্টায় সে চক্রান্তকে ব্যর্থ করতে পারে না ? কেন সে কুয়াশার ঘড়িতে আটটা বাজতে শুনলো ? মনের ভুল···মস্তিষ্ক বিকৃতি ? কেন রেণী তাকে আসতে বারণ করে আবার আটটার সময়ই আসতে বললো ? সে তো ইচ্ছে করলে না যেতেও পারে। সে তো উন্মাদ হয়ে যায়নি, তার ইচ্ছার ওপর নিশ্চয়ই তার জোর আছে ! তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে তাকে···

মেনার্ড দেখে সে রেণীর বাড়ির ভেতরে হ্যাট রাখবার জায়গায় হ্যাট-টা রেখেছে। আটটা কি বেজেছে ? মেনার্ড বসবার ঘরের দিকে এগিয়ে চলে ··বসবার ঘরের দরজা খোলা কিন্তু জাপানী পর্দা দিয়ে ঢাকা, ঘরের ভেতর নিঃস্তব্ধ।

মেনার্ড পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখে ঘরের একধারে রেণী দাঁড়িয়ে দরজার দিয়ে মুখ করে। দরজার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠদেহ এক পুরুষ। দেয়ালে ঘড়ির ওপর নজর পড়লো। সেই কালো এবনি দিয়ে মোড়া ঘড়ি। আটটা বাজতে আর চার মিনিট বাকি !

মেনার্ডের সমস্ত মন যেন ঘড়ির পেণ্ডুলামের সঙ্গে দুলতে থাকে। ঘরের ভেতর রেণীর সামনে সেই অজানা লোকটির অস্তিত্ব তার চেতনার মর্মমূলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। নিজের অজ্ঞাতসারে মেনার্ড পকেটে হাত দেয়। হ্যাঁ···রিভলভারটা ঠিকই আছে।

ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করে পরুষ-কণ্ঠে বলে ওঠে রহস্যময়

অভ্যাগত, রেণী তুমি জান, আমি যত ভুলই করি, যত অপরাধই করি নাকো—তোমাকে আমি ভালবাসি। সেখানে তুমিই আমাকে অপমান করেছ। কিন্তু এ খেলা তোমাকে আর আমি খেলতে দেবনা।

রেণী পাথরের মতন স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মতন গর্জন করে ওঠে পুরুষ, এই তোমাকে শেষবার বলছি রেণী···ঘড়িতে আর মাত্র দু'মিনিট বাকি—আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে আমার সঙ্গে চলে আসতে হবে—যদি না আস, তাহলে জেনে রেখো, আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি—এই দেখ—

লোকটি পকেট থেকে রিভলভার বার করে সোজা রেণীর বুকের দিকে তুলে ধরে—

—জেনো রেণী এই আমার শেষ কথা—এবং সেই সঙ্গে জেনে রেখো, আজ তোমার বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে রিভলভারসুদ্ধ যে হাত আমি তুলেছি, এ আমার হাত নয়—এ ভবিতব্যতার হাত—ক্ষমাহীন—অমোঘ—

মেনার্ড পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে তুলে ধরে—নিমেষের মধ্যে তার ভেতরে কি যেন স্থির সিদ্ধান্ত করে নিয়েছে, ক্ষমাহীন, অমোঘ—চকিতের মধ্যে তার নয়নের ওপর ভেসে ওঠে, তাকে সাহায্য করবার জন্যেই এই ভয়াবহ প্রেত-মুহূর্তের সৃষ্টি হয়েছে···তার জন্যেই আজ লণ্ডনের পথ-ঘাট আচ্ছন্ন করে নেমেছে ঘনতম কুয়াশা—এই কুয়াশার মধ্যে

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না ·

অনায়াসে সে ওই সামনের লোকটির মৃতদেহ সন্দেহাতীতভাবে ফেলে আসতে পারবে—কেউ দেখতে পাবে না—কেউ জানতে পারবে না—

ঘরের ভেতর লোকটি রেণীর দিকে রিভলভার তুলে বলে, আর এক মিনিট মাত্র—আটটার ঘণ্টা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা আওয়াজ হবে—তারপর—আজকের এই কুয়াশা —এ আমার জন্যেই এমন ঘন হয়ে নেমেছে—এ অন্ধকারের মধ্যে আমার চিহ্ন আর কেউ খুঁজে পাবে না। রেণী, কথা বল, উত্তর দাও—

পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রেণী বলে, আমি—যাব—না—

দেয়ালে ঘড়িতে আটটার প্রথম আওয়াজ বেজে ওঠে—ছুটো—তিনটে—

—রেণী—রেণী—এখনো বলো—

ঠিক কুয়াশার ঘড়িতে স্বুরের যে রেশ জাগিয়ে থেমে গিয়েছিল আটটার ঘণ্টার আওয়াজ, তেমনি স্বুরের রেশ জাগিয়ে বেজে উঠল শেষ আওয়াজ···সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়ল একটা রিভলভারের শব্দ···

ঘরের ভেতরের লোকটি সশব্দে মাটিতে গেল পড়ে—মেনার্ডের গুলি তার গলা ভেদ করে চলে গিয়েছে।

রেণী চোখ চেয়ে দেখে, সামনে দাঁড়িয়ে মেনার্ড।

গুলির আওয়াজে বাড়ির ঝি ছুটে আসে। রেণী স্থিরকণ্ঠে

তাকে আদেশ করে, যেমন করে হোক এই কুয়াশার মধ্যে এই মৃতদেহ সরিয়ে ফেলতে হবে।

মেনার্ড সাহায্য করে।

রাত্রি নিশীথে মেনার্ড ভাবে, এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে-নাটকের অভিনয় হয়ে গেল, তার নায়ক কে? কে তার প্রযোজক? কে রচনা করল সেদিনের অপরাহ্নের সেই প্রেত-মুহূর্ত? কে তাকে অক্ষরে অক্ষরে জানিয়েছিল অগ্রবর্তী ঘটনার সমস্ত পূর্বাভাষ? কে তাকে অনিবার্যভাবে টেনে নিয়ে গেল সেই প্রেত-লগ্নে? সে কি ভগবান? ভগবানই যদি হয়, তবে কি ভগবানই তার মধ্যে এসেছিলেন হত্যাকারীরূপে?

উদ্‌ভ্রান্তভাবে মেনার্ড সব কথা রেণীকে বলে। নীরবে শোনে নারী।

বাঁশীওয়ালা

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

বাঁশীওয়ালা নাম দেখে আপনারা কেউ ভাববেন না যেন, আমি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'বাঁশীওয়ালা' কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে বসেছি। আমার এ বাঁশীওয়ালার কাহিনী জীব-জগতের এক অদ্ভুত আবিষ্কার, যার সম্বন্ধে মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কোনও ব্যাখ্যা করা চলে না।

সেটা ছিল ১৯৩৬ সালের জুন মাস। গরমের ছুটিতে আমরা শিলং পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলুম। আমাদের বাংলোটা ছিল ঠিক পুলিস বাজার রোডের উপর। পীচ

বাঁধানো রাজপথের একধারে আমাদের বাংলো, অপর ধারে ছিল মস্ত বড় একটা সরকারী হাসপাতাল। তার পিছনে বহুদূর পর্যন্ত পার্বত্য প্রান্তর বেষ্টিত করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে গগনচুম্বী শ্যামল সতেজ পাইন বন। আশেপাশে বেশি বাড়ি ঘর না থাকার জন্য আমাদের পারিপার্শ্বিক ছিল অত্যন্ত নির্জন।

সেখানে ছিল আমাদের অখণ্ড অবসর। সারাদিন খাওয়া বিশ্রাম আর বেড়ানো। কাজেই রাত্রে চোখে কিছুতে ঘুম আসত না। প্রায়ই রাত্রি বেলা শোবার আগে আমরা যন্ত্রসঙ্গীতে ঐকতানবাদন করতুম। আমার দিদি অন্নপূর্ণা বাজাত সেতার, ছোটবোন রেণু বাজাত বেহালা, আর আমি বাজাতুম বাঁশী। আমাদের সে সঙ্গীত-আসরের শ্রোতা থাকত, মাত্র দুজন। একজন ভাই, অপরজন ভৃত্য। বাজনার বিরতি কালে, আমি প্রায়ই শুনতে পেতুম, আরও কোথাও কে যেন বাঁশী বাজাচ্ছে। একদিন কি মনে হ'ল, সকলে শুয়ে পড়লে দরজা খুলে আমি গিয়ে বাইরের বারান্দায় দাঁড়ালুম। শুনতে পেলুম বাস্তবিক অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে একটা ভারি সুন্দর ও করুণ বাঁশীর সুর। ঠিক মনে হচ্ছে, কে যেন কাকে সুরে সুরে ডাকছে। আমি অনেক বাঁশী শুনেছি কিন্তু এমন মিষ্টি হাতের সুর আর কখনও শুনিনি। বেশ মনে আছে সেটি ছিল একটি অতি সাধারণ ভাটিয়ালী সুর। বাংলা-দেশে তখন ভাটিয়ালী গানের মধ্যাহ্ন বেলা। গিরীন্দ্র চক্রবর্তী, শচীন দেববর্মণ, কমলা ঝরিয়া প্রভৃতি শিল্পীদের প্রাণ-মাতানো

ভাটিয়ালী গানে তখন দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত। কাজেই ভাটিয়ালী সুর শেখা তখন খুবই সহজ ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বাঁশীর সেই সাধারণ ও অদ্ভুত সুরটা আমি বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনা সত্ত্বেও তার একটি লাইনও কিছুতে মনে রাখতে পারলুম না।—কই এমন তো কখনও হয়নি! আমারও কেমন রোখ চেপে গেল, ওই সুরটা আমি শিখবই। এদিকে রাত্রি যে ক্রমশ অস্তপথে গমন করছে—সেদিকে কোনও হুঁস নেই। এমন সময় হাসপাতালের ঘড়ি সুউচ্চে প্রহর ঘোষণা করায় সচকিত হয়ে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি ঘরে গিয়ে শয্যা গ্রহণ করলুম। কিন্তু শুলে কি হয়, বাঁশীর সেই সুর সমানভাবে আমার কানের পাশে বাজতে লাগল।

পরের দিন ঘুম ভাঙতেই মনে পড়ে গেল সেই সুরের কথা। ভাল করে কান পেতে শুনলুম, না এখন আর কোথাও সে বাঁশী বাজছে না, তবে তার সেই অদ্ভুত সুরের রেশ আমার মনের উপর দিয়ে পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি আশ্চর্য, কে এমন করে বাঁশী বাজায়? তার হাতে কি যাদু আছে? নানা কথা ভাবতে ভাবতে আমি নিচে নেমে গিয়ে মাঠের মধ্যে দাঁড়ালুম। রাত্রি বেলা যেদিক থেকে বাঁশীর সুর ভেসে আসে, মুক্ত প্রান্তরের সেদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে দেখলুম আমাদের সীমার মধ্যে একটি মাত্র বাড়ি দৃষ্টিগোচর হয়, তাছাড়া আর সবই পাইনবনাচ্ছাদিত অসমতল বনভূমি। তখন আমার মনে হ'ল নিশ্চয়ই ওই বাড়িটাতেই কেউ বাঁশী বাজায়। তা না

হলে, ওই বনের মধ্যে বসে রাতদুপুরে কে বাঁশী বাজাবে ? এখন যেমন করেই হোক, ওই বাংলোর লোকদের সঙ্গে আলাপ করে বাঁশীওয়ালাকে আবিষ্কার করে, তার কাছ থেকে ওই অদ্ভুত সুরটা শিখতেই হবে। বাড়িটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম। এক সময় দেখলুম বারান্দায় আমাদেরই বয়সী একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। ভাব করবার জন্য আমি তাকে লক্ষ্য করে হাসলুম। কিন্তু দুঃখের বিষয় বোধ হয় দূরত্বের জন্যই সে আমার আপ্যায়ন দেখতে পেল না। অতদূর থেকে উচ্চকণ্ঠে আলাপ করাও কিছু শোভন নয়। কি করা যায় এখন ? ভাবতে ভাবতে আমি বাড়ির মধ্যে চলে এলুম। চা খেতে খেতে দিদি অন্নপূর্ণার কাছে সেই রহস্যময় সুরের কথা বললুম। সব শুনে দিদি বললে, 'দেখ, ওই বাড়িতে কেউ বাঁশী বাজায় কি না তা না জেনে মিছামিছি ওদের সঙ্গে ভাব করতে গিয়ে কি হবে ? তার চেয়ে সুদেবকে (ভৃত্য) পাঠিয়ে দাও, সে জেনে আসুক ও বাড়িতে কেউ বাঁশী বাজায় কিনা।'

সুদেব তখন বাজার যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল ; আমি তাকে বলতেই বাজারের থলি রেখে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে খবর দিল, ও বাংলোতে বাঁশী বাজানোর কোনও লোক নেই। ওখানে থাকেন একটি রুগ্ন মেয়েকে নিয়ে তার মা। খবর দিয়ে সে বাজারে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের অস্বস্তি দ্বিগুণতর হয়ে উঠল। সমস্ত হৃদয় উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে উঠল, কখন রাত্রি আসবে, কখন

শুনব সেই সুর! ক্রমে রাত্রি আসে, বাঁশীও বাজে, আমিও ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে শুনি সেই সুর, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার একটি লাইনও আমি মনে ধরে রাখতে পারি না।

আমাদের বাংলোর পাশের মাঠে প্রায়ই বিকেলে টেনিস খেলতে আসত রূপসীর জমিদার বাড়ির অনেকে। তখনকার জমিদারের দু'টি নাতনীর সঙ্গে আমার ছোট দুই বোন বীরা ও রেণু ডায়োসেশন স্কুলে পড়ত। কলকাতায় ওদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের সৌহার্দ্য ছিল। ওরাও শিলংএ গরমের ছুটি কাটাতে এসেছিল। ওরা টেনিস খেলত, আমাদের কিন্তু সেই পাহাড়ী জায়গায় টেনিস খেলতে মোটে ভাল লাগত না। আমরা রোজ নতুন নতুন জায়গা আবিষ্কার করে সেখানে বেড়াতে যেতুম। গভীর অরণ্যের মধ্যে অদেখা কোনও ঝর্নার ধারে, কিম্বা পর্বতের কোনও দুর্গম রন্ধ্রে প্রবেশ করে সকলে যখন আনন্দে মত্ত হয়ে উঠত, আমি কিন্তু সেই আনন্দে প্রাণ খুলে যোগ দিতে পারতুম না। আমার দৃষ্টি ও মন সর্বদা সজাগ হয়ে থাকত সেই বাঁশীর সুর শোনবার জন্য বা কোনও বাঁশীওয়ালার হঠাৎ দেখা পাওয়ার জন্য। একদিন আমরা লাবানে ক্রিনোলিন ফল্‌সের ধারে বেড়াতে গিয়েছি। তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে। একটি বড় উপলখণ্ডের উপর সকলে বসেছিলুম। প্রচণ্ড গর্জন করে পাহাড়ের মাথার উপর থেকে নেমে আসছে প্রমত্ত ঝরণার ধারা। রাশি রাশি মুকুতার ফুল ফুটিয়ে উপলাঘাতে পিষ্ট হয়ে ক্রমশ সে নীচের দিকে নেমে

যাচ্ছে নদী হয়ে। এক সময় সেই প্রপাতের গর্জনের মধ্যে থেকেও আমি শুনতে পেলুম খুব আস্তে আস্তে সেই বাঁশী বাজছে। এবং সুরটা ভেসে আসছে প্রপাতের মাথার উপরের ঘন অরণ্যবেষ্টিত পাহাড়ের মধ্য থেকে। আমার হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রীতে একটা অদ্ভুত শিহরণ স্পষ্ট অনুভব করলুম। মনে হ'ল এই সুরটা শোনবার জন্যই বুঝি আমি এতক্ষণ বসে ছিলুম। কে বাজায় এই অদ্ভুত সুরে বাঁশী? আমি মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলুম। শুধু ইচ্ছা করতে লাগল, পাহাড়ের মাথায় উঠে একবার দেখলে কি হয়. কে বাজাচ্ছে বাঁশী। তার বাঁশীটাই বা কেমন?—যার রন্ধ্র থেকে ঝরে পড়ছে এই রহস্যময় সুরের ঝর্না, যে সুর শুধু কানে শোনা যায়, শত চেষ্টা সত্ত্বেও মনে ধরে রাখা যায় না। কিন্তু আমার ইচ্ছার কথা কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারলুম না। কেন না আমি জানতুম এই পাহাড়ে উঠতে হলে অনেকটা বনজঙ্গলের পথ অতিক্রম করতে হবে। আর এই রাত্রি বেলা আমাদের পক্ষে তা সম্ভবপর নয়। কাজেই মনের ইচ্ছা মনে চেপে সকলের সঙ্গে বাড়ি ফিরে এলুম।

সেইদিন রাত্রিবেলা লক্ষ্য করলুম, বাঁশী আর বাজল না। অনেক রাত্রি পর্যন্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলুম। কিন্তু সেই সুর আর শুনতে পেলুম না। মনে মনে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে চেষ্টা করলুম। কিন্তু আশ্চর্য, হাল্কা নিশ্বাসের পরিবর্তে মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি খচখচ করে উঠল, সুরটা

আমার শেখা হ'ল না! আর দু'দিন বাঁশী বাজলে, চেষ্টা করে দেখতুম শিখতে পারি কি না। কোথায় সুর, কে বাঁশীওয়ালা, তার কিছুই ঠিক নেই, তবু আমার মন তার পিছনে কেন যে এমন পাগলের মত ছুটে বেড়ায়, আমি কিছুতে বুঝতে পারি না, আমি কিছুতে তাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারি না।

তার কয়েকদিন পর দুপুর বেলা কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম এল : রেণু ম্যাট্রিক পাস করেছে এবং আমাদের অবিলম্বে বাড়ি ফিরতে হবে। আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য শীঘ্রই জামাইবাবু আসছেন। খবর দুটি শুনে মনে একদিকে যেমন আনন্দ হ'ল প্রচুর, অপর দিকে আবার সেই কলকাতার ইট কাঠ, কাজ আর কোলাহলের মধ্যে ফিরে যেতে হবে মনে করে মনটা খারাপও হয়ে গেল ভীষণ। পাসের খবর নিয়ে ওরা তখন খুব হৈ চৈ করছিল, দিদি অন্নপূর্ণা বাড়িতে চিঠি লেখায় খুব ব্যস্ত ছিল। সেই সুযোগে কাউকে কিছু না বলে আমি বাইরে বেরিয়ে পড়লুম। একটা ঝর্নার ধারে গিয়ে বসতেই মনের মধ্যে জেগে উঠল সেই সুরের রেশ। ভাবলুম রোজ রাত্রে হয়তো বাজবে সেই বাঁশী, কিন্তু আমি আর এখানে থাকব না, আমার আর শোনাও হবে না, শেখাও হবে না সেই সুর। অনেকক্ষণ বসে ছিলুম, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, একবার ওয়ার্ড লেকে যেতে হবে। সেখানকার মালী বলেছিল কয়েকটি ভালো জাতের গোলাপের কলম দেবে। কলকাতায় ফিরে যাওয়ার তাড়ায় হয়তো ওখানে আর যাওয়া হবে

না, কিন্তু এখানে আসার সময় মা বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন গোলাপের কলম নিয়ে আসার জন্য। ধীরে ধীরে উঠে লেকের পথে রওনা হলুম।

ওয়ার্ড লেকের মধ্যে একেবারে শেষের দিকে আরও খানিকটা নীচের দিকে নেমে গিয়ে, একটি বোটানিক্যাল বাগান আছে। মালীর কুটীর ছিল সেই উদ্ভিদশালার মধ্যে। বিশাল বনস্পতি থেকে শুরু করে নানা জাতীয় বৃক্ষাদিতে বাগানটি এমন ভাবে আকীর্ণ যে দিনের বেলাতেও সেখানে সন্ধ্যাবেলা বলে ভ্রম হয়। উদ্ভিদশালা তখন গভীর নির্জনতায় থমথম করছিল। নানা কথা ভাবতে ভাবতে তার মধ্যে দিয়ে আমি পথ অতিক্রম করে চলেছি। পায়ের নীচে শুকনো পাতা মর্মর করছে। পাইন বনের ঠাণ্ডা বাতাসে হাড়ের মধ্যে কাঁপন লাগছে—এমন সময় আমি শুনতে পেলুম খুব কাছেই কোথাও সেই বাঁশী বাজছে। চকিত হয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করতেই আমার সামনে একটু অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে একটি পাইন গাছের নীচে আমার দৃষ্টি আটকে গেল। সেখানে গাছে হেলান দিয়ে বসে একটি যুবক বাঁশী বাজাচ্ছিল। বেশবাস তার অতি সাধারণ, তবে চোখ দুটি তার অদ্ভুত ধরনের উজ্জ্বল। সেই অত্যুজ্জ্বল চোখ দুটি শূন্যের পানে মেলে বসে বসে সে বাঁশী বাজাচ্ছিল। তাকে দেখতে পেয়েই আমি সেইখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। দুই কান ভরে শুনতে লাগলুম সেই সুর, কিন্তু সে আমার দিকে দৃকপাত মাত্র না করে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে হাঁটতে

শুরু করল এবং একটি প্রকাণ্ড গাছের পিছনে যেতেই আমি তাকে আর দেখতে পেলুম না। কিন্তু বাঁশী সেই রকম ভাবেই বাজতে লাগল। আমি সামনে পিছনে ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করলুম। কিন্তু গভীর জঙ্গলে তার গন্তব্যপথ আচ্ছন্ন। কাজেই তাকে আমি আর দেখতে পেলুম না। সে গেল কোথায়? আমার সমগ্র চেতনা গভীর উৎকণ্ঠায় ব্যগ্র হয়ে উঠলো, ও কেন অমন করে বাঁশী বাজায়? ওর সুরে কিসের যাদু আছে? সে যাদু কেন আমার মনকে এমনভাবে স্পর্শ করে? অথচ সে স্পর্শকে আমি ধরে রাখতে পারি না। যতই ভাবি, ভাবনার কোনও কূল-কিনারা পাই না। মাথার মধ্যে সমস্ত গোলমাল হয়ে যায়। পায়ের নীচে মাটি যেন আটকে গেছে, ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি সে স্থান ত্যাগ করতে পারছি না—কে যেন আমায় সেখানে জোর করে ধরে দাঁড় করিয়ে রেখে কোন আড়ালে গিয়ে বসে বাঁশী বাজাচ্ছে। এক সময় যখন বাঁশী থেমে গেল, তখন সচেতন হয়ে আমি বুঝতে পারলুম যে, পথ ভুল করে আমি অনেক দূরে বনের মধ্যে চলে এসেছি। সঙ্গে সঙ্গে স্থান ত্যাগ করার জন্য মন ব্যগ্র হয়ে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যে লোকালয়ে এসে, সূর্যের মুখ দেখে বুঝতে পারলুম, আমার ভীষণ মাথা ধরেছে এবং গা গুলোচ্ছে। কোনও রকমে বাড়ি ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লুম। সকলেই জানতো আমার মাঝে মাঝে ভীষণ ব্যথা ধরে, তাই সেদিনের মাথা ধরা নিয়ে কেউ অকারণে ব্যস্ত হয়ে পড়েনি। কোথা দিয়ে যে রাত্রি কেটে গেল জানি

না। পরের দিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতে দেখলুম, মাথা ধরা সেরে গেছে, কিন্তু মনটা ভীষণ ভার হয়ে রয়েছে। মনে পড়ল, মার গোলাপের কলম তো আনা হয়নি। তাড়াতাড়ি উঠে সুদেবকে বলে কলম আনার ব্যবস্থা করে ভাইবোনদের সঙ্গে যাত্রার আয়োজনে যোগ দিলুম। ইচ্ছা সত্ত্বেও গত দিনের ঘটনার কথা দিদির কাছে বলতে পারলুম না। ভারী লজ্জা করতে লাগল, ও যদি হেসে বলে, 'ও সব তোমার উদ্ভট কল্পনা।'

সত্যি, সেদিনের সে-কথা মনে হলে আজও আমি বুঝতে পারি না, সে বাঁশীওয়ালা কে? তার সুরটাই বা কি? তার অদ্ভুত কলাকুশলতা কোন্ মায়ায় মন্ত্রসিদ্ধ? এখনও আমি কিছুই বুঝতে পারি না। তারপর তো কত বাঁশীর কত সুর শুনেছি, কত শিখেছি, কত ভুলে গেছি। যদিও বাঁশীওয়ালার সেই সুরটা শিখতে পারিনি, তথাপি তার সেই মনে মনে কথা বলা রেশটা তো আজও ভুলতে পারলুম না। শিলংএর সেই পাইনবন বেষ্টিত পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে আজও কি সেই বাঁশী তেমনি করে বাজে? রাত্রির বাতাসে ভেসে বেড়ায় তার করুণ মূর্ছনা?

রহস্যময়ী নারী

গোপাল ভৌমিক

যে ঘটনাটির কথা বলতে যাচ্ছি সেটি ঘটেছিল রংপুর জেলার রাণীগঞ্জ গ্রামে। রংপুর বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। কার্যোপলক্ষে এই রংপুর জেলারই একটি গণ্ডগ্রাম রাণীগঞ্জে আমার বাবা জমিজমা কিনে স্থায়ী বসবাস করেছিলেন। আমাদের আদি বাস ছিল ঢাকা জেলায়। এ গ্রামের যারা মূল বাসিন্দা তাদের অধিকাংশই ছিল রাজবংশী মুসলমান। উচ্চ বর্ণের হিন্দু যে তুই এক ঘর ছিল তারা সকলেই ছিল পূর্ববঙ্গাগত। স্থায়ী বাসিন্দারা ছিল শিক্ষাদীক্ষায় একেবারে অনগ্রসর আর

কুসংস্কার ছিল তাদের মজ্জাগত। এই রাজবংশীদেরই মধ্যে ধনী জোতদার ছিলেন শ্রীরজনীকান্ত সরকার। ইনি দেশবিভাগের পর এখনও সেখানে আছেন। তাঁর জোতদারী পরিচালনা করতেন আমার বাবা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভৌমিক। আমার বাবা সম্প্রতি মাস ছয় সাত হল এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে। রাণীগঞ্জ গ্রামের চার মাইল পরিধির মধ্যে কোন হাইস্কুল ছিল না। রোজ সকালে সাড়ে চার মাইল পায়ে হেঁটে গিয়ে আমরা পড়তাম উলিপুর মহারাণী স্বর্ণময়ী হাইস্কুলে। ভূত প্রেত দৈত্য দানবে বিশ্বাস দেখেছি রংপুরবাসীদের মজ্জাগত। কারও কালাজ্বর হলে গ্রামবাসীরা বলত যে ভূতে পেয়েছে। এই পরিবেশের মধ্যে মানুষ হলেও আমার মনটা কি করে জানি না প্রথম থেকেই ছিল সংস্কারমুক্ত। ছোট বয়সেও ভূতপ্রেত বিশ্বাস করি নি—আজও বিশ্বাস করি না।

সঙ্গী-সাথীদের অনেকের মুখেই নানা ভূতের কাহিনী শুনেছি। নানারকম রঙ চড়িয়ে তারা নিজেদের অভিজ্ঞতার কাহিনী বলেছে। পল্লীগ্রামের সেই নিভৃত পরিবেশে নিশুতি রাতে দূর শ্মশানভূমিতে সঞ্চরণশীল আলেয়ার আলো দেখিয়ে তারা আমাকে ভূতপ্রেতে বিশ্বাসী করে তুলতে কম চেষ্টা করে নি। কিন্তু সফল হয় নি তারা। সেই আমার জীবনেই যে একদিন এক ভৌতিক কাণ্ড ঘটে, আমার ধ্যান-ধারণার মূলকে শিথিল করে দেবার চেষ্টা করবে তা আমি ভাবিনি কোনদিন। এই ভৌতিক কাণ্ডটির সঙ্গে আবার জড়িয়ে আছে একটি

মানবীরও কাহিনী। সুতরাং সবিস্তারেই ঘটনাটি বলি।

বাবা যে জোতদারের বাড়িতে কাজ করতেন সেই রজনী-বাবুর চক-মিলানো বড় বাড়ির সঙ্গেই লাগান ছিল আমাদের ছোট বাড়ি। সংসারে মানুষ ছিলাম আমবা ছয় জন—বাবা, মা, আমি, আমার ছোট দুই ভাই ও একটি বোন। বাবা চাকরী ও আমাদের নিজেদের জমিজমার তদারকী নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। গৃহের যাবতীয় কাজই করতে হত মাকে। মা খুব খাটতে পারতেন—সুতরাং দিবারাত্রি হাসিমুখেই তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন। মাঝে মাঝে সংসারের কাজে নীচজাতীয়া পল্লীরমণীদেরও সাহায্য নিতেন তিনি। কিন্তু বিপদ দেখা দিত যখন আমাদের কোন ভাই বা বোন হবার সময় হত। তখন সংসারে একজন সাহায্যকারিণী না থাকলে প্রায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হত। আমাদের আত্মীয়-স্বজন সকলেই থাকতেন দূরে দূরে। রাজবংশী জাতের স্ত্রীলোকদের রান্না করা খাবার বাবা স্পর্শ করতেন না। এই অবস্থায় পড়ে আমার চতুর্থ ভ্রাতাটির জন্মের অল্প কিছুদিন পূর্বে বাবা স্থির করলেন যে তিনি আসাম থেকে গ্রাম সম্পর্কে আমাদের পিসীমা হন এমনই একটি বিধবা ভদ্রমহিলাকে আনবেন আমাদের সাংসারিক কাজে সহায়তার জন্যে। তিনি ছিলেন আমাদের স্বজাতি—নাম ছিল তাঁর প্রেমদা। তিনি বাল্যবিধবা ছিলেন বলে সন্তানাদির কোন ঝামেলাও তাঁর ছিল না। আসামেও তিনি আমাদেরই এক আত্মীয়গৃহে রন্ধনাদি কাজ করে পেট চালাতেন।

যাক, যথাসময়ে প্রেমদা পিসীমাকে আসাম থেকে নিয়ে এলেন বাবা। তাঁকে আমাদের সবারই মোটামুটি ভাল লাগল। দেখতে শুনতে তিনি যেমন মন্দ ছিলেন না, তেমনি দেহে মনেও তাঁর ছিল যৌবনের চঞ্চলতা। সামাজিক অনুশাসনে বিধবাদের পক্ষে এ জিনিসটি যে গর্হিত তখন এ বোধ জন্মায় নি আমার মনে। তবে বিধবাদের পক্ষে শাঁখাসিঁদুর না পরা ও থান কাপড় পরা যে অবশ্য কর্তব্য তা আমি জানতাম। প্রেমদা পিসী রাণীগঞ্জ আসবার দুই চারদিন পরেই একদিন ভরসন্ধ্যা বেলা দেখি তিনি ঘরের কোণে বসে বসে আয়নায় মুখ দেখছেন। কিশোর মনের কৌতূহল নিয়ে দূরে দাঁড়িয়েই চুপি চুপি দেখলাম সে দৃশ্য। দেখলাম তিনি আপন মনে গুন্ গুন্ করে গান গাইছেন আর সঙ্গে সঙ্গে ভাল করে চুল বেঁধে মার সিঁদুরের কৌটা থেকে সিঁদুর পরছেন মাথায়। তারপর নিজের চেহারা দেখে নিজেই যেন বিমুগ্ধ হয়ে রইলেন তিনি। আমি বিস্মিত হয়ে রইলাম—বুঝতে পারলাম না কিছুই। বিধবারা যে গোপনে এ ধরনের প্রসাধন করেন—সে ধারণা ছিল না আমার! যাই হোক, এ নিয়ে কারও সঙ্গে কোন কথা আমি বলি নি। কিন্তু এর দুইচারদিন পরে প্রেমদা পিসীর এই গোপন প্রসাধনপ্রয়াস ধরা পড়ল মার হাতে এবং বলা বাহুল্য প্রচুর লাঞ্ছনা সহ্য করতে হল তাঁকে। তারপর থেকে লক্ষ্য করলাম যে প্রেমদা পিসী আর রাণীগঞ্জে থাকতে ইচ্ছুক নন—ফিরে যেতে চান আসামে। কিন্তু বাবা তাঁর প্রস্তাবে কান দিতে

চাইলেন না। তাঁকে আসাম থেকে আনতে বাবার বেশ কিছুটা কষ্টার্জিত অর্থব্যয় হয়েছিল। সুতরাং তাঁকে দু'চার মাস রেখে আসামে ফেরত পাঠানোব কোন ইচ্ছা ছিল না বাবার।

এর কয়েকদিন পরে রাত্রিবেলা বাবা আর আমি খেতে বসেছি রান্নাঘরে। রাত তখন গোটা নয়েক হবে। কৃষ্ণপক্ষ বলে বাইরে ছিল ঘন অন্ধকার। ছোট ভাইবোনেরা খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমরা রান্নাঘরে বসে লণ্ঠনের আলোকে খাচ্ছিলাম আর পাশে বসেছিলেন মা। পরিবেশন করছিলেন প্রেমদা পিসী। অকস্মাৎ রান্নাঘরের পিছনে ধপ্ করে একটা শব্দ হল—যেন কেউ ভারি কোন জিনিস ছুঁড়ে ফেলল। বুদ্ধি দিয়ে ভূতে বিশ্বাস করি আর নাই করি—সেই শব্দ শুনে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। বাবা কিন্তু আদৌ ঘাবড়ালেন না। বাবার মত সাহসী লোক আমি খুব কমই দেখেছি। বাবা বললেন যে, আমাদের যে পেঁপে গাছটা ছিল, তা থেকে কোন পেঁপে হয়তো পড়েছে। কিন্তু আমরা কেউ তাতে খুব একটা নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। মা বললেন যে, সেদিন দুপুরেও তিনি পেঁপে গাছটি দেখেছেন—কিন্তু গাছে কোন পাকা পেঁপেই ছিল না। যাই হোক, খেয়ে দেয়ে মুখ ধুয়ে বাবা মা আমাকে সঙ্গে নিয়ে লণ্ঠন হাতে করে গেলেন রান্নাঘরের পিছনে সেই অস্বাভাবিক শব্দের কারণ নির্ণয় করতে। গিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমাদের চক্ষু প্রায় চড়ক গাছ। দেখি পেঁপে গাছের নীচে পেঁপে তো নয়—একখণ্ড গোটা ইঁট পড়ে আছে।

কোথা থেকে সেই ইঁট এল, তখন তাই নিয়ে চলল গবেষণা। রাণীগঞ্জের মত গ্রামে ইঁট জিনিসটি পাওয়া সহজ ছিল না। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সে ইটটি ছিল একেবারে নতুন-ভাঁটি পোড়ানো। আমাদের বাড়ির ত্রিসীমানায় নতুন ইট পাবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। আমাদের গ্রাম থেকে এক মাইল পশ্চিমে এক ধনী জোতদার ইট পুড়িয়েছিলেন। অনেক গবেষণার পর স্থির হল যে, এ ইট যে এনেছে সে সেই ইটের ভাঁটি থেকেই এনেছে। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হল না। অত রাত্রে ও ইঁট কে-ই বা নিয়ে এল আর কেনই বা আমাদের রান্নাঘরের পিছনে ছুঁড়ল—তা সমান রহস্যাবৃতই রয়ে গেল।

যাই হোক, কিছুক্ষণ পরে আমরাও ইঁটের কথা ভুলে যেতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু প্রতিকূল ঘটনার চাপে একদিনের বেশি সে কথা ভুলে থাকা সম্ভব হল না। পরদিন রাত্রে আবার আমাদের ঘরের বেড়ার উপর এসে পড়ল ইঁট। সেদিন রাত্তে ইঁট ছোঁড়ার পরিমাণ কিছু বাড়ল। আমাদের বাড়িতে গোয়ালঘর নিয়ে ঘর ছিল তিনটি। মজা এই যে অন্য ঘরে ইঁট পড়ল না—পড়ল এসে সেই ঘরে যে ঘরে প্রেমদা পিসী শুয়েছিলেন। আমিও এই সব কাণ্ড দেখে রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। বাবা ভয় না পেলেও রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। জোতদার বাড়ির সংলগ্ন আমাদের বাড়িতে ঢিল ছুঁড়বে—এত সাহস বোধ হয় ও অঞ্চলের কোন লোকের

ছিল না। আশেপাশের দশ গাঁয়ের লোক ছিল ওই জোত-দারেরই প্রজা এবং তখনও অজ্ঞ সাধারণ প্রজাদের মধ্যে জোতদার-ভীতি ছিল অত্যন্ত প্রবল। তা ছাড়া আমার বাবা প্রায় নিঃশত্রু মানুষ ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। নিজের সাধুতা, ন্যায়পরায়ণতা ও পরোপকারস্পৃহার দরুন তিনি ছিলেন প্রজামহলের অত্যন্ত প্রিয়। এ অবস্থায় ইঁট নিক্ষেপ-কারী যে মানুষ—এ বিশ্বাস বড় একটা কারও মনেই জাগল না। আমাদের হাঁকডাকে সেই মধ্যরাতে জোতদার বাড়ির পাইকবরকন্দাজ-সহ স্বয়ং জোতদার রজনীবাবুও এলেন। রজনীবাবুর বন্দুক ছিল। যে দিক থেকে ঢিল আসছিল সেদিক লক্ষ্য করে একাধিকবার বন্দুকের গুলীও নিক্ষেপ করা হল। কিন্তু কাজ হল না কিছুই। মাঝে মাঝে বিরাম দিয়ে যেমন ঢিল পড়ছিল তেমনি পড়তে লাগল। সেদিন ভোর পর্যন্ত প্রায় এই কাণ্ডই চলল। আমাদের কারও আর ঘুম হল না। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে ঢিল পড়াও বন্ধ হ'ল। এই ব্যাপারে প্রেমদা পিসীর বড় একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করিনি। তাঁর ভাব ছিল অনেকটা পূর্বের মতই নির্বিকার।

পরদিন থেকে আর একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করা গেল। সেদিন রাতে সন্ধ্যার দিকেই ঢিল পড়তে লাগল এবং চলল সেই ভোরবেলা পর্যন্ত। অতঃপর প্রতিদিন সন্ধ্যা হতে না হতেই ঢিল পড়তে আরম্ভ হত এবং শেষ হত ভোরবেলা। আর একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করতাম। এ ঢিলের লক্ষ্য আসলে

আমরা কেউ বড় একটা ছিলাম না। ঢিলের মূল লক্ষ্য ছিলেন প্রেমদা পিসী নিজে। রাত্রিবেলা তিনি যে ঘরে যে দিকে শুতেন ঢিল আসত সেই দিক থেকে। বেড়ার গায়ে যেখানে কোন ফুটো থাকত সেইখান দিয়ে আসত ঢিল। হাতের টিপ দেখে স্বভাবতঃই মনে হত যে এ ঢিল কখনও মানুষ ছুঁড়তে পারে না। একদিন সন্ধ্যার সময় প্রেমদা পিসী রান্না-ঘরের পাশে কুয়ো থেকে জল তুলছিলেন। এমন সময় একটা বড় ইষ্টক খণ্ড এসে লাগল তাঁর কপালে। তিনি চিৎকার করে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন—তাঁর মাথা ফেটে বেরুলো রক্ত। তাঁকে ধরা-ধরি করে দাওয়ায় উঠিয়ে শুশ্রূষা করলাম। প্রতিনিয়ত কি উদ্বেগের মধ্যে যে আমাদের রাতগুলি কাটত, তা আর বলবার নয়।

এই ঘটনা ঘটবার সময় মার মুখ থেকে ধীরে ধীরে অনেক রহস্যজনক কথাই এল আমাদের কানে। মা-বাবার মুখ থেকে জানা গেল যে, প্রেমদা পিসী নিজেই নাকি ভূতপ্রেত, দৈত্য-দানব আমদানী করার মন্ত্র জানতেন। তাঁর পিতা এই সব মন্ত্রতন্ত্রের একজন বড় সাধক ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই প্রেমদা পিসী এসব শিখেছিলেন। কৈশোরে তাঁর যখন বিয়ে হয়েছিল তখন পারিবারিক জীবনেও তিনি শান্তি পান নি। যে কোন কারণেই হোক, স্বামীগৃহ তাঁর ভাল লাগত না এবং তিনি স্বামীগৃহে থাকতেও চাইতেন না। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই বা সহজে তাঁকে বাপের বাড়ি যেতে

দিতে চাইবে কেন? শ্বশুরকুলের হাত থেকে এ রকম বাধা পেলেই নাকি প্রেমদা পিসী নিজের পিছনে নিজে ভূত লাগাতেন এবং ভূত এই ধরনের ঢিল ছুঁড়ে তাঁর শ্বশুরকুলকে করে তুলতো অতিষ্ঠ। তখন তাঁরা বাধ্য হয়েই তাঁকে বাপের বাড়ি যেতে দিতেন এবং তিনি বিদায় নিলেই বাড়িতে ঢিল প্রভৃতি ছোঁড়া বন্ধ হয়ে যেত। এমনি করে দুই এক বছর বিবাহিত জীবন কাটাবার পর তাঁর স্বামীবিয়োগ হয়। তার পর থেকে তিনি পিতৃগৃহেই ছিলেন। পরে পিতার মৃত্যুতে বাধ্য হয়েই তিনি জীবিকার জন্যে অন্যের বাড়িতে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। আমাদের বাড়িতে ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ির পর মা স্পষ্টই ঘোষণা করলেন যে, এ সব প্রেমদা পিসীরই কাজ—তিনি নিজেই নিজের পিছনে ভূত লাগিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হল আমাদের অতিষ্ঠ করে তুলে তাঁর আসাম ফিরে যাবার পথ সুগম করা।

প্রেমদা পিসী যে ভূতের মন্ত্রতন্ত্র জানতেন, তার আর একটি অকাট্য প্রমাণও দিলেন মা। প্রেমদা পিসী রাণীগঞ্জ আসার কয়েকদিন পরেই মাকে ভূত দেখাতে চেয়েছিলেন। তিনি মাকে বলেছিলেন যে, মাত্র এক জোড়া গোটা পানসুপারী ও তেল সিন্দুর পেলেই তিনি মাকে ভূত দেখাতে পারেন। মা কিন্তু এ প্রস্তাবে রাজী হন নি। মার আপত্তির কারণ ছিল এই যে, তিনি একা থাকেন—যেখানে ভূত দেখবেন সেখানে ভবিষ্যতে তিনি আর একা চলাফেরা করতে পারবেন না। এই অবস্থায় আমাদের সকলের মনেই নিশ্চিত ধারণা জন্মালো যে

প্রেমদা পিসী নিজেই নিজের পিছনে ভূত লাগিয়েছেন এবং আমাদের বাড়ির উপর থেকে সহজে এ ভূতের উপদ্রব যাবে না। তারপর দুই এক দিন যেতে না যেতেই ভূতের উপদ্রবের আর একটি নতুন পর্যায় দেখা দিল। এতদিন ঢিল পড়ত শুধু রাত্রি বেলায়—এবার দিনের বেলাতেও ঢিল পড়তে আরম্ভ করল। সারাদিন সারারাত ধরেই চলত এই ঢিলের উৎপাত। ঢিল যে অবিচ্ছিন্নভাবে সব সময় পড়ত এমন নয়। ঢিল পড়ার কোন সুনির্দিষ্ট সময় ছিল না। আর এই সব ঢিলের মূল লক্ষ্য ছিলেন প্রেমদা পিসী। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, বহুবার তাঁর গায়ে ঢিল এসে লাগতে আমি দেখেছি—কিন্তু অন্য যারা আমাদের বাড়িতে ছিল তাদের কারও গায়েই কোন ঢিল পড়তে দেখি নি। আমাদের বাড়িতে এই ধরনের উপদ্রব প্রায় মাসখানেক চলেছিল। ক্রমাগত ঢিল পড়ায় শেষ পর্যন্ত ঢিলের ভয় বড় একটা আমাদের ছিল না। আমাদের গায়ে ঢিল পড়ে কি না দেখার জন্যে আমরা মাঝে মাঝে আট দশজন প্রেমদা পিসীকে ঘেরাও করে দাঁড়াতাম। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকবার পর হঠাৎ দেখতাম শূন্য থেকে একটা ঢিল সবেগে এসে পড়েছে প্রেমদা পিসীরই গায়ে। আমাদের কারও গায়েই ঢিল লাগত না।

উপদ্রব দেখা দেবার পর বাবা নানাভাবে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করলেন। এ উপদ্রব যে মনুষ্য-সৃষ্ট নয়—তা প্রায় দিবালোকের মতই স্পষ্ট ছিল। কাজেই বাবা বাধ্য

হয়ে আশ্রয় নিলেন তুক-তাক, ঝাড়-ফুঁক প্রভৃতি মন্ত্রতন্ত্রের। একাধিক ওঝা এল গেল—কিন্তু প্রতিকার হল না কিছুই। ইত্যবসরে উপদ্রব উঠছিল ক্রমশঃই চরমে। প্রেমদা পিসীর জীবন তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনও হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। প্রেমদা পিসীকে দিয়ে তখন আর কোন কাজকর্ম করানো চলত না। তার কারণ ইঁট-পাটকেল ছাড়াও নানাবিধ অস্পৃশ্য দ্রব্য তখন এসে পড়তে আরম্ভ করেছিল বাড়িতে। প্রেমদা পিসী হয়তো খেতে বসেছেন—তখন হঠাৎ দেখা গেল একটা গরুর হাড় এসে পড়ল তাঁর পাতে। এ অবস্থায় মা আর তাঁকে কোন কাজ করতে দিতেন না। তাঁকে কাঁসার বাসনাদিতে খেতে দেওয়াও হত না। তাঁর জন্যে কলাই করা এলুমিনিয়মের বাসন এনে দেওয়া হল এক সেট। তাঁর নিজের শাস্তিও বড় একটা কম হত না। গৃহে তিনি অনেকটা অস্পৃশ্যের মতই হয়ে পড়েছিলেন। ঘরেও তাঁকে থাকতে দেওয়া হত না—রান্নাঘরেও তাঁকে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। একদিকে প্রেমদা পিসীর এই শাস্তি—অন্যদিকে তজ্জনিত আমাদের দুর্ভোগ। এই অবস্থার সম্মুখীন হয়ে বাবা স্থির করলেন যে, প্রেমদা পিসীকে তিনি একবার ও অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ওঝা ইয়াসিন মোল্লাকে দেখাবেন এবং তাতেও যদি কোন ফল না হয়—তখন তিনি তাঁকে রেখে আসবেন আসামে।

বাবার সিদ্ধান্তমত একদিন সন্ধ্যাবেলা ওঝা ইয়াসিন মোল্লা এসে হাজির হল। সেদিন সন্ধ্যাবেলা থেকে চলল ভূত

তাড়ানোর আয়োজন। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সেই প্রয়াসই চলল। দিনটি ছিল শনিবার—অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি। ইয়াসিন মোল্লা আমাদের উঠানে প্রথমেই খড়ি দিয়ে কতকগুলি দাগ কেটে একটা ঘরের মত করল। সেই ঘরের মধ্যে প্রেমদা পিসীকে শুইয়ে দেওয়া হল। আমাদের উঠানে সেদিন ভীড় জমে গেল গ্রামবাসীদের। ইয়াসিন বলল যে, সে মন্ত্রের জোরে রোগিণীকে অজ্ঞান করে ফেলবে এবং তারপর তার দেহে প্রেতাত্মার আবির্ভাব ঘটিয়ে তার মুখ থেকে সব কথা আমাদের শোনাবে। প্রেতাত্মা যখন আসবে তখন আশে পাশের গাছ-গুলিতে জোরে ডাল নড়ার শব্দ আমরা শুনতে পাবো। আর ভূত যদি শেষ পর্যন্ত রোগিণীকে ছেড়ে যেতে সম্মত হয়, তবে যাবার সময় আশে পাশের কয়েকটি গাছের ডালপালা ভেঙে সে চলে যাবে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তার ভূত তাড়ানোর প্রক্রিয়া আরম্ভ হল। কিছুক্ষণ পরে সত্যসত্যই আশে পাশের গাছগুলিতে হুড়মুড় করে শব্দ হতে লাগল। আমরা বুঝলাম যে ভূত এসেছে। মাটিতে শোয়া প্রেমদা পিসীকে ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ইয়াসিন তখন রোগিণীর চারদিকে খড়ি দিয়ে যে ঘর আঁকা ছিল তার বাইরে মাটির উপর সপ্ সপ্ করে বেত্রাঘাত করতে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে অদূরবর্তিনী প্রেমদা পিসী যন্ত্রণায় ছট ফট করতে লাগলেন। তখন ওঝা একটির পর একটি প্রশ্ন করতে লাগল রোগিণীকে। আর রোগিণীর মুখ দিয়ে কথা বলতে লাগল

স্বয়ং সেই ভূত। প্রশ্নোত্তরে যেটুকু জানা গেল তাতে বোঝা গেল যে, বহুদিন পূর্বে আমাদেরই গ্রামের কালীপদ বর্মণ বলে যে যুবকটি আত্মহত্যা করেছিল সে-ই ভর করেছে প্রেমদা পিসীর ঘাড়ে এবং আমাদের বাড়িতে যত কিছু উৎপাতও করছে সেই। ওঝার কাকুতি মিনতি ও ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও ভূত কিছুতেই রোগিনীকে ছেড়ে যেতে রাজী হল না। বহু চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত ওঝা ব্যর্থতা স্বীকার করল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যতক্ষণ ওঝা বাড়িতে ছিল ততক্ষণ একটি ঢিলও পড়েনি। ওঝা চলে যাবার পরেই আবার উপদ্রব চলল পূর্বের মতই।

এই অবস্থায় পড়ে বাবা স্থির করলেন যে, প্রেমদা পিসীকে আসামেই রেখে আসবেন। ওঝা-পর্ব সমাধার একদিন পরে তিনি প্রেমদা পিসীকে নিয়ে রওনা হলেন আসামের উদ্দেশে। ও অঞ্চলে তখনও মোটর-বাসের প্রবর্তন হয় নি। আমাদের ওখান থেকে কুড়িগ্রাম রেল-স্টেশনের দূরত্ব ছিল ষোল মাইল। যেতে হত পায়ে হেঁটে অথবা গরুর গাড়িতে। বাবা সকালবেলা খেয়ে-দেয়ে গরুর-গাড়িতে করে প্রেমদা পিসীকে নিয়ে রওনা হলেন স্টেশনের উদ্দেশে। প্রেমদা পিসী বাড়ি থেকে চলে যাবার পর আমাদের বাড়িতে কোনদিন আর ঢিল পড়ে নি। বাবা ট্রেনে করে কুড়িগ্রাম থেকে তিস্তা জংশন পর্যন্ত গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে। তিস্তা জংশনে টিকিট কেটে তাঁকে গাড়িতে বসিয়ে দিয়ে বাবা তার পরদিন ফিরে এলেন বাড়িতে। তাঁর মুখে শুনেছি যে, তাঁরা যখন গরুর গাড়িতে যাচ্ছিলেন তখন

ফাঁকা মাঠে তাঁদের গরুর গাড়ির উপরও ঢিল পড়েছিল। কিন্তু ট্রেনে ওঠার পর আর কোন ঢিল পড়ে নি।

ছোট বয়সে এই রহস্যময় ভৌতিককাণ্ডের কোন মর্মোদ্ধার তো আমি করতেই পারি নি—আজ পরিণত বয়সেও এ ব্যাপারটি আমার কাছে সমান রহস্যময়ই হয়ে আছে। ভৌতিক ব্যাপারে বিশ্বাস আমার নেই। কিন্তু বুদ্ধি দিয়েই বা এ রহস্যের কি ব্যাখ্যা করব ?

সতীনের দৃষ্টি

শান্তিলতা বসু

সে আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বের ঘটনা, কিন্তু আজও আমি আমার বুদ্ধির দ্বারা এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারিলাম না। আমার পিতা তখন আড়ংঘাটা স্টেশনের স্টেশনমাস্টার ছিলেন, তখন আমার বয়স পনেরো বৎসর হইবে, স্টেশনের কয়েক ঘর পরিবারের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা ছিল বেশী, কারণ তখন ঐ স্থানে আশে-পাশে লোক খুব কমই ছিল। যদি রেলের কর্মচারী বাবুদের মধ্যে কেহ বদলী হইতেন তবে আমরা নিজেদের আত্মীয় কেহ কোথাও চলিয়া যাইতেছেন এইরূপ দুঃখ

অনুভব করিতাম, কিন্তু নূতন লোকের আগমনের আনন্দও ঐ বয়সে মন্দ লাগিত না। কবে নূতন লোক আসিবে তাহারই প্রতীক্ষায় থাকিতাম, এবং সকলেই মনে ভাবিতাম আমাদের বয়সী একটি মেয়ে যেন আসে। হঠাৎ একদিন বাবার মুখে শুনিলাম, নূতন টিকিটবাবু আসিতেছেন। বেশ আনন্দ অনুভব করিলাম, কিন্তু পর মুহূর্তেই পুরাতন মেয়েটির জন্য দুঃখ অনুভব হইল। বিকালে নূতন খবরটি মেয়েদের কাছে বলিলাম, এবং প্রত্যেকেই নূতন লোকের আগমন প্রতীক্ষায় রহিলাম। কয়েক দিন পর টিকিটবাবু আসিলেন। সঙ্গে দুইটি মেয়ে, দুইটি ছেলে ও তাঁহার স্ত্রী। প্রথমে আমরাই দল বাঁধিয়া তাঁহাদের বাসায় গেলাম এবং মেয়ে দুটির সঙ্গে আলাপ করিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলাপ জমিয়া গেল। প্রত্যেক দিনই কিছু সময় বিকালে আমরা নানা গল্পে ও খেলায় সময় কাটাইতাম।

দিনগুলি মন্দ কাটিতেছিল না। প্রায় ছয় মাস বাদে একদিন শুনিলাম আমাদের বন্ধু বড় মেয়েটির বিবাহ। তার নাম নির্মলা। এই শুভ সংবাদে আমরা সকলেই বেশ আনন্দিত হইলাম এবং নির্মলাকে নানারূপ প্রশ্ন ও ঠাট্টা করিতে লাগিলাম। শুভদিনে পাত্রপক্ষ মেয়েকে আশীর্বাদ করিয়া গেলেন ও বিবাহের দিন ধার্য করিলেন। বিবাহের লগ্ন একটু বেশী রাত্রেই পড়িয়াছিল বলিয়া আমার মনে পড়িতেছে, বাসর-ঘরে বর ও কনেকে রাখিয়া ফিরিতে আমাদের একটু রাত হইয়া গেল। পরদিন ভোরে স্নান করিয়া বাসা হইতে চা খাইয়া

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না

আমরা কয়েকজন মেয়ে একসঙ্গে হইয়া নতুন জামাইয়ের সহিত আলাপ করিতে গেলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, বিবাহবাড়ি যেন একেবারে নির্মলাকে নিয়াই ব্যস্ত। আমরা প্রথমেই নির্মলার কাছে গেলাম। নির্মলার মুখ গম্ভীর, শুষ্ক চোখে যেন ভয়ার্ত ভাব। কারণ কিছু বুঝিলাম না। তাহাকে আমরা অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সে আমাদের সহিত কোন কথাই বলিল না। আমরা একটু বিরক্ত হইলাম বটে, তারপর আমরা ভাবিলাম নূতন জামাই নগেনবাবু হয়ত এই ব্যাপার কিছু জানেন, নচেৎ সদাহাস্যময়ী নির্মলার কি এমন হইল যাহাতে আমাদের সহিত কথা বন্ধ করিল। নিশ্চয় নগেনবাবুর দোষ। নগেনবাবু কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না, শুধু বলিলেন, রাত্রি দু'টার সময় নির্মলা বাহিরে যায় আর ঘরে আসে নাই। নগেনবাবুর সহিত আলাপ করিয়া আমরা বেশ খুশি হইলাম, কিন্তু নির্মলাকে আমরা আর ঘরে আনিতে পারিলাম না। বিকালে মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করিল, যাওয়ার সময় খুবই কান্নাকাটি করিল। তিনদিন পর নির্মলা বাপের বাড়ি ফিরিল। খবর পাইয়া আমরা সকলে তাহাকে দেখিতে গেলাম, কিন্তু এ কি! তিনদিনে তাহার এত পরিবর্তন কেন? সে বিশেষ কাহারও সহিত কথা কহিতেছে না। নির্মলার বৌদির মুখে শুনিলাম তাহার উপর কিসের যেন দৃষ্টি পড়িয়াছে। আরও শুনিলাম, নগেনবাবুর পূর্বে একবার বিবাহ হইয়াছিল, সেই বউ মারা যাওয়ার এক বৎসর পর এই বিবাহ হয়। জামাই দ্বিতীয়

পক্ষ, কাজেই সকলে বলাবলি করিতেছে সতীনের দৃষ্টি পড়িয়াছে। নির্মলার নিকট শুনিলাম, তাহার ওখানে খুব ভয় করিত। সে চলাফেরা করিলে মনে হইত তাহার পিছনে কে যেন চলিতেছে। সে তাহার স্বামীর বিছানায় গেলে দেখিতে পায় একটি সতেরো-আঠারো বৎসরের সুন্দরী বধূ তাহার দিকে ক্রুদ্ধভাবে চাহিয়া আছে। এই দৃশ্যে ভয়ে সে আড়ষ্ট হইয়া যায় এবং চিৎকার করিয়া ওঠে। তাহার চিৎকারে তাহার স্বামী ও অন্যান্য সকলে জাগিয়া যায়। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কাহাকেও কিছু দেখাইতে পারে না। ভয়ে নিজেই কাঁপিতে থাকে। নির্মলা পিত্রালয়ে আসিয়া এই ব্যাপার বলে।

কাজেই ওঝাকে খবর দেওয়া হইল। ওঝা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলে, সতীনের দৃষ্টিই হইয়াছে! নির্মলাকে আনিয়া বসান হইল এবং ওঝা মন্ত্রপূত সরিষা মেয়েটির গায়ে ছুঁড়িয়া দিতে লাগিল। নির্মলাও চিৎকার করিতে করিতে বলিতে লাগিল, আমি কিছুতেই যাব না, যাব না। ওঝাও বলিতে লাগিল, তোকে যেতেই হবে। এইরূপ কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি বলিল, ও আমার স্বামীকে নিয়েছে, আমি কিছুতেই আমার স্বামী ওকে দেব না। ওঝা বলিল, তোকে যেতেই হবে। কিছুক্ষণ বাদে শুনিলাম, আচ্ছা আমি যাই। সঙ্গে সঙ্গে নির্মলা অজ্ঞান হইয়া গেল। ওঝা বলিল, ভূত ছাড়িয়াছে। সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িল। কিছুদিন পর নগেনবাবু শ্বশুরবাড়ি আসিলেন। কিন্তু এ কি! এত চেষ্টায়ও কি ভূত ছাড়িল না!

নির্মলা তার স্বামীর ঘরে গেল না, এবং নগেনবাবুর সহিত কথা বলিতে পারিল না। আমরা ঠাট্টা করিয়া তাহার বরের কথা বলিলে দেখিতাম, তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া যাইত এবং তাহার হাসি গল্প সব বন্ধ হইয়া যাইত। আমি আজও আমার বুদ্ধির দ্বারা কিছুতেই ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। জানিনা আমাদের বাল্যবন্ধু আজ কোথায়, এবং সে তাহার জীবনে স্বামীর ঘর করিতে পারিল কিনা।

যোগবল

ডাঃ কুঞ্জেশ্বর মিশ্র

আঠারো বৎসর বয়সে যে সত্য-ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারি নাই, আজ এতদিন পরে তাহা স্মৃতিপথে উদয় হওয়াতে আমি তাহা সুধী, বৈজ্ঞানিক, মনস্তত্ত্ববিদ মনীষীগণের গোচরার্থ এই প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিলাম।

আমি তখন রাজসাহী কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে এফ, এ পড়ি। বাসস্থান পল্লীগ্রাম হইতে পিতা ঠাকুরের পত্রে আমার ছোট জ্যেষ্ঠতাত দাদা ও আমাকে জোড়া কালী-পূজার প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ সহর হইতে লইয়া অবিলম্বে

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না

বাড়ি যাইবার জন্য জরুরী আদেশ আসিল ভাদ্র মাসের এক-দিন। আমরা বাড়ি পৌঁছিয়া অকস্মাৎ অসময়ে এই পূজার কারণ যাহা জানিতে পারিলাম তাহা অভূতপূর্ব। আমার জ্যেঠামহাশয় ও জেঠিমার মৃত্যুর পর আমার পিতাঠাকুর তাঁহার দুই পুত্রকে তাঁহার নিজের সংসারে আনিয়া পুনরায় একান্নভুক্ত করিয়া জ্যেষ্ঠের বিবাহ এই ঘটনার এক বৎসর পূর্বে দিয়াছিলেন। ১৪।১৫ বৎসর বয়স্কা আমাদের বউদিদির রং কালো হইলেও তাঁহার মুখশ্রী ও দেহের গঠন-সৌন্দর্যের জন্য পিতাঠাকুরের বড়ই পছন্দ হইয়াছিল। কনিষ্ঠভ্রাতা রাজসাহীতে তখন সবেমাত্র একটা চাকুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন! তিনি সমস্ত জিনিসপত্র ও আমাকে সঙ্গে লইয়া যখন বাড়ি পৌঁছিলেন তখন আমরা দেখিলাম বউদিদির ঘন ঘন ফিট হইতেছে। তিনি অজ্ঞান অবস্থায় এত জোরে হাত পা ছুঁড়িতেছেন ও উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, আমাদের মত দুই তিনজন বলবান যুবকও তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে হিম্‌সিম্ খাইতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে আবার ফিটের স্বল্পকাল বিরাম হইলে অজ্ঞানও হইতেছেন। অসময়ে হঠাৎ এই পূজার কারণ যাহা শুনিলাম তাহা এইরূপ—

চার দিন পূর্বে প্রথম ফিট হওয়ার পর অর্ধচৈতন্য অবস্থায় তিনি বলিয়াছেন—'গত বৎসর এই বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে আমার মূর্তির (কালীর) পূজার পরদিন প্রাতে বিসর্জনের সময় আমারই মত দেখিতে এই বধূটি ঘর গোবর দিতে দিতে ভাল

করিয়া হাত পা না ধুইয়াই আমাকে বরণ করিতে আসে। তাহার সেই অশুচি অবস্থায় আমাকে স্পর্শ করিবার জন্যই আমি তাহার দেহে আশ্রয় করিয়াছি; ইহার পূর্বে এই আসনে আমার আর একবার যে মানসিক পূজা হয় তাহার ভোগের ময়দা যখন কুঞ্জেশ্বর মাখিতেছিল তখন তাহার মুখ হইতে চর্বিত পানের সুপারি সেই ময়দার উপর হঠাৎ পড়িয়া যায়। সে আমায় অনেক স্তুতি করিয়া প্রার্থনা করিয়া বলিল 'মা! আমার অপরাধ হইয়াছে, কিন্তু এই রাত্রিতে পাড়াগাঁয়ে এত ময়দা আর পাওয়া যাইবে না, তোমার লুচি-ভোগ হইবে না। আর যে সমস্ত নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক ও অন্যান্য জনসাধারণ এই প্রসাদ পাইবার জন্য সমস্ত রাত জাগিয়া বসিয়া থাকিবে তাহাদেরও এই প্রসাদ প্রাপ্তি ঘটিবে না। কিন্তু জানি তুমি ইহা খাইবেও না, কেবল নিবেদন মাত্র করা হইবে। হয়তো ইহা অপেক্ষা অনেক পূর্বে অশুচি অবস্থার মধ্য দিয়ে এই ময়দা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাও তোমার অজানা নাই। বিশেষ এই কথা প্রকাশ করিলে আমাকে প্রহার পর্যন্ত খাইতে হইবে। এই নিরুপায় অবস্থায় আমাকে মাপ করিবে এই আশা করিয়াই আমি এই ময়দা তোমার ভোগের লুচি প্রস্তুতের উপযুক্ত করিয়া মাখিয়া দিলাম।' তখন তাহার এই আবেগপূর্ণ প্রার্থনাতে আমি খুশিই হইয়াছিলাম। এখন আগামী মঙ্গলবারে আমার জোড়া প্রতিমা পুনর্বার ষোড়শোপচারে পূজা করিলেই আমি তৃপ্ত হইয়া এই মেয়েটির দেহ হইতে অন্তর্হিত হইব এবং ইহার

এই রোগও চিরতরে সারিয়া যাইবে।' গ্রামসুদ্ধ সমস্ত লোক এই কথা শুনিয়াছিল এবং সকলেই আসিয়া আমাকে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। আমি স্বীকার করিয়া বলিলাম, ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য এবং আমার তখনকার কথাগুলি প্রায় হুবহু বলা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যখন অন্ধকার রাত্রিতে বারান্দায় একা বসিয়া আমি এই ময়দা মাখিতেছিলাম তখন সেই ঘরে বা আশেপাশে কোন লোক ছিল না—অন্যথা কেহ দেখিলে বা ঘুণাক্ষরেও ইহা জানিতে পারিলে তাহাদের মতে এত বড় একটা অন্যায় লইয়া হৈ চৈ হইত। সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য এই যে, এই ঘটনার এক বৎসর পরে এই বৌদিদির বিবাহ হইয়া তিনি আমাদের বাড়িতে আসেন। তিনি কি করিয়া এই ঘটনা জানিবেন? এই পূজা আমার খুড়ো মহাশয়ের মানসিক পূজা—দীপান্বিতার সময় অনুষ্ঠিত হয়।

দুই দিন অবিরাম ভায়োলেণ্ট ফিটের সময় তাঁহাকে সজোরে ধরিয়া রাখিতে রাখিতে এবং রাত্রি জাগরণে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম। মঙ্গলবার রাত্রিতে গ্রামেই নির্মিত প্রতিমা দুইখানির পৃথক পৃথক পূজা আমার পিতৃদেবই সম্পন্ন করিলেন। যে ঘরে আমি বৌদিদিকে লইয়া ব্যস্ত ছিলাম সেখান হইতে দুইটি অঙ্গন পার হইয়া বহির্বাটিতে চণ্ডীমণ্ডপে বাদ্যসহ পূজা হইতেছিল। প্রায় পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী এই পূজার সময় বৌদিদির একটি বারও ফিট হয় নাই, তিনি ঘোর নিদ্রিত অবস্থায় কাটাইতেছিলেন।

যেমন ঢাকে বিসর্জনের বাজনা বাজিল অমনি আবার এত জোরে ফিট আরম্ভ হইল যে, আর কিছুতেই তাঁহাকে বিছানায় আটকাইয়া রাখা যায় না। এই অবস্থায় একবার ধনুকের মত উঠিয়া ধপাস করিয়া বিছানায় পড়িয়া অজ্ঞান হইলেন। পিতা ঠাকুর সংবাদ পাইয়া মণ্ডপ হইতে আসিয়া দেখিতে পাইলেন নাড়ী নাই, নিশ্বাস প্রশ্বাসও প্রায় চলিতেছে না। তিনি দুর্গা নাম জপ করিতে করিতে বলিলেন, 'মা! তোমার ইচ্ছামত সমস্ত অনুষ্ঠান করিলাম, কি ত্রুটি হইয়াছে জানি না। তোমার মতই দেখিতে এই মেয়েটিতে তোমার প্রতিমূর্তি-সর্বদা চাক্ষুষ করিবার জন্যই ইহাকে বধূরূপে বরণ করিয়া গৃহে আনিয়াছি। ইহাকে লইয়া যদি তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হয় তাহাই হউক।'

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বৌদিদির নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হইল এবং তিনি এই কয়েকদিন পরে মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিলেন ও অঙ্গবস্ত্র* সংবরণ করিয়া অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রথম প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং পূজনীয় গুরুজন চলিয়া গেলে আমাদের সহিত কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কেন এ অসময়ে ভরা বর্ষার সময় বাড়িতে আসিয়াছি। পরে এই সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলাতে তিনি বলিলেন, এ সমস্ত বিষয় তিনি কিছুই জানেন না এবং সত্যই সেদিন ঘরে গোবর লেপন করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ ডাকাডাকির জন্য তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া মণ্ডপে গিয়েছিলেন।

আমি কখনও কাহারও নিকট আমার সেই রাত্রির ঘটনা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করি নাই এবং তাহা সম্পূর্ণ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। আমি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও ইহার কোনও যুক্তিসম্মত সমাধান আজ পর্যন্ত করিতে পারি নাই।

হানাবাড়ি

পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ বছর আগের কথা।

তখন আমি বঙ্গবাসী ইস্কুলে মাষ্টারি করি। পাঁচ বছরে পনেরটি বাসা বদলিয়ে এবার যে বাসাটির সন্ধান পেয়েছি, সেটি সত্যিই ভারি সুন্দর। চার কামরাওয়ালা দোতলা একটি বাড়ি। সামনেই ছেলেমেয়েদের খেলাধূলা করার 'পার্ক'। ঘরগুলির মেঝে মার্বেল পাথরে মোড়া। বারান্দা ও সিঁড়ি 'মোজাইক' করা। উপরে ও নিচে বাথরুম ইত্যাদি। চমৎকার ব্যবস্থা। ভাড়া মাসিক চল্লিশ টাকা মাত্র। ইস্কুল মাষ্টারের

পক্ষে ভাড়াটা একটু বেশি হ'লেও বাড়ি হিসাবে আদৌ বেশি নয়। এমন বাড়ি অনেক তপস্যায় মেলে। বাড়ি দেখে মা ত খুশি হলেনই, স্ত্রী ও ছেলেরাও মহাখুশি। মনে হ'ল, এতদিনে বাসা-সমস্যার একটা সমাধান হলো। মধ্য কলকাতায় ছোট-খাটো এমন একটা বাড়ি সত্যিই দুর্লভ। দু'তিন মাস অন্তর বাসা বদল ক'রে ক'রে হয়রান হ'য়ে গেছি। ভাড়াটা একটু বেশি হ'লো! তা হোক্‌গে। বাড়িওয়ালা বা সহভাড়াটের সঙ্গে কচ্‌কচি আর ভালো লাগে না। এবার নির্ঝঞ্ঝাট! বাড়িওয়ালা থাকেন কিছুটা দূরে, অন্য কোন ভাড়াটেব ঝামেলাও নেই। পরিবারের সকলেই একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে এবার।

নতুন বাড়িতে এসে গেছি। সামনের পার্কে ছেলেরা খেলা করে, বাইবেব ঘরে বসে বসে আমি দেখি। বেশ একটা আরাম ও তৃপ্তি অনুভব করি। সেদিন ছিল রবিবার। ছেলেরা পার্কে খেলছে আমি বাইরের ঘরে ব'সে কি একটা লিখছি। এমন সময় বাড়ির ভেতব থেকে একটা কান্নার সুর ভেসে আসে কানে। মেয়েছেলের কান্না! কে কাঁদে? ভেতরে গিয়ে দেখি, একটি বিধবা বউ তাঁর দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বেড়াতে এসে নিচের বারান্দায় ব'সে কান্না জুড়ে দিয়েছেন। আমার মা সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁকে কি যেন বলতে চেষ্টা করছেন। ব্যাপার কি? কান্নার ভেতর দিয়ে ক্রমে ব্যাপারটা পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। আগতা বিধবার স্বামী অনেক আশা ক'রে এই বাড়িটা তৈরি করেছিলেন, কিন্তু ভোগ করতে পারেন নি।

দেনার দায়ে বাড়ি বাঁধা পড়ে। কর্তাকেও রোগে ধরে। দু'এক মাসের মধ্যেই তিনি নিজে কেঁদে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে কাঁদিয়ে এই বাড়িতেই দেহ রাখেন। তাঁর কত সাধের এই বাড়ি। কার বাড়ি, আজ কে ভোগ করে!·· ইত্যাদি ইত্যাদি। মা তাঁকে অনেক ক'রে বোঝালেন। সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে ছোট-খাটো একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেললেন। তাঁর ছেলেমেয়েদের হাতে সামান্য কিছু মিষ্টি আনিয়ে দিলেন। বিধবাকেও কিছু জল খাওয়াতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। যা হোক, অনেকটা সময় কাটিয়ে বিধবা চোখ মুছতে মুছতে ও দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে চলে গেলেন, আমিও হাঁফ ছেড়ে বাইরের ঘরে এসে বসলাম। মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। খুব ছোট হ'লেও বাড়িটা সত্যই সুন্দর! এতো অল্প জায়গার মধ্যে, বোধ হয় এক কাঠাও হবে না, এমন সুন্দর একটা বাড়ি বানাতে ভদ্রলোককে বেশ মাথা খাটাতে হয়েছে। শুনলাম ভদ্রলোক নিজে কণ্ট্রাক্টর ছিলেন, তাই পেরেছেন। ভাবতে ভাবতে—খাকি হাফ্-প্যাণ্ট পরা, হ্যাটমাথায় একটা কণ্ট্রাক্টরের ছবি আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠলো—যেন তিনি বাড়িটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাকিয়ে থাকার মতো বাড়ি বটে! ছবির মতো বাড়িটা—সব কিছুই এর সুন্দর। ঘর ছেড়ে বাইরে এসে আমিও বাড়িটার দিকে কিছু সময় তাকিয়ে রইলাম। মনে পড়লো বিধবাটির কথা—তাঁর কতো সাধের বাড়ি!

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না।

নতুন বাড়িতে দশ-পনেরো দিন কেটে গেছে। একটা জরুরি কাজে শহর ছেড়ে দু'এক দিনের জন্য বাইরে যেতে হবে। সকালেই সামান্য কিছু জলযোগ সেরে ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছি, এমন সময় আমার পিঠে কে যেন সজোরে একটা ধাক্কা দিয়ে ব'লে উঠলো, যা, বেরিয়ে যা, আর আসিস নে! হুমড়ি খেয়ে আমি সামনের বারান্দার রেলিং ধরে ফেললাম। মা ব'লে উঠলেন, 'কি হ'লো রে, চৌকাঠে হুঁচোট খেয়েছিস বুঝি? বাধা পড়লো, একটু বসে যা।'

আমি বললাম, 'হুঁচোট খাইনি। কে যেন আমায় ধাক্কা দিলে।'

মা বললেন, 'সে কি রে!'

স্ত্রী বললেন, 'ওমা সে কি কথাগো! তুমি কি বলছো?'

আমি বললাম, 'কিছু নয়, মা, বোধ হয় দরজার পাল্লার গায়ে ধাক্কা খেয়ে থাকবো।'

'তবু একটু বসে যা; বেরুবার মুখেই বাধা পড়লো!' মা বললেন। তথাস্তু। একটু বসে যেতে হ'লো।

শহর ছেড়ে কিছু দূর যেতে না যেতেই বেশ কম্প দিয়ে জ্বর এসে গেল। কাজেই বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হ'লো। বাসায় ফিরে একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়লাম। সেই অজ্ঞান অবস্থায় মনে হ'লো, কে যেন বলছে, 'বাড়িটা খুব সুন্দর দেখছিস, না? দাঁড়া তোর চোখের মাথা খেয়ে দিচ্ছি।'

পরদিন সকালবেলা জ্বরটা অনেক কম দেখা গেল বটে, কিন্তু চোখে বিষম যন্ত্রণা। চোখ আর মেলতে পারি না। জোর করে মেললে হু হু ক'রে জল আসে। তখনই বন্ধ ক'রে ফেলতে হয়। সকলে মনে করলেন, আমিও ভাবলাম, ঠাণ্ডা লেগে চোখ উঠেছে। বোরিক কম্প্রেস্ করা, বোরিক-জল দিয়ে চোখ ধোয়া সমানে চলতে লাগলো। কিন্তু তিন-চার দিনের মধ্যেও বিশেষ কিছু উপশম দেখা গেল না। অবস্থা একই প্রকার রইলো। সকলে চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন।

আজ আমার অসুখের পঞ্চম রাত্রি। প্রায় দেড়টা বেজেছে, এমন সময় মা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'খোকা, খোকা, একবার ওঠ্ ত !'

পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হলেও মার কাছে তখনো আমি খোকাই ছিলাম। চোখের যন্ত্রণায় ঘুম আমার একরূপ ছিল না বললেই হয়। মার ডাকে তখনই সাড়া দিয়ে দরজা খুলে বাইরে এলাম। স্ত্রী উঠে ঘরের ও বারান্দার ইলেকট্রিক আলো জ্বেলে দিলে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি মা, কি হয়েছে ? ব্যাপার কি ?' চোখ দুটোকে কোনোরকমে তুলে ধরে মার দিকে তাকিয়ে দেখি, চোখ তাঁর কপালে উঠে গেছে, তিনি কাঁপছেন। স্ত্রী গিয়ে তাড়াতাড়ি মাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলো, 'মা, মাগো, কি হয়েছে মা ? অমন করছেন কেন ?' মা শুধু আঙুল দিয়ে একটা কিছু দেখিয়ে দিলেন। আমরা কিন্তু

সেদিকে কিছুই দেখতে পেলাম না। বাড়ির সকলেই তখন উঠে পড়েছে। চারদিকে আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। তবু কিছুই দেখা গেল না।

মাকে ধরে ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'লো। চোখে-মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে দিতে কিছু সময় পরে তিনি যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তখন একটু একটু ক'রে সব কথা বললেন। ঘুম থেকে উঠে আলো না জ্বেলেই তিনি বাইরে আসেন। বাইরে এসে দেখেন, বারান্দায় হাফ্‌-প্যান্ট-পরা, হ্যাট-মাথায় একটা লোক আমার ঘরের জানালা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি তার আমার ঘরের মধ্যে—। মা বলে উঠলেন, কে, কে ওখানে দাঁড়িয়ে? হ্যাট-মাথায় লোকটি তখন এমন কটমট ক'রে মার দিকে ফিরে দাঁড়ালো যে, মা ভয় পেয়ে 'খোকা খোকা' ব'লে চেঁচিয়ে ওঠেন। মূর্তিটা তখন ওই দিকটায় সরে যায়।

মুখে আমি বললাম, এ নিশ্চয়ই কোন দুষ্ট লোক। পাইপ টাইপ ধরে নেমে পালিয়েছে। মনের ভেতর কিন্তু ভেসে উঠলো সেই কণ্ট্রাক্টরের ছবি। মা আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। তিনি বলতে লাগলেন, 'তোরা এ বাড়ি ছেড়ে দে। ভালো বাড়িতে আমাদের আর দরকার নেই। আমার মন আর কিছুতেই ভালো নিচ্ছে না।

অনেক করে মাকে বুঝিয়ে রেখে আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম। সমস্ত রাত্রি বাড়িতে আলো জ্বালিয়ে রাখা হ'লো।

মার কাছে রইলো আমার ছোট ভাই ও এক বিধবা বোন। সেই রাত্রিতেই মা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হলেন। ডাক্তার ডাকা হ'লো, চিকিৎসাও যথাসাধ্য করা হ'লো, কিন্তু মাকে ধরে রাখা গেল না। তিন দিনের দিন সকলকে কাঁদিয়ে মা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। মৃত্যুর কিছু সময় পূর্বে মা একবার আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমার জন্যে তুই এতো করছিস কেন? আমার সময় হয়েছে—ডাক এসেছে, আমি চলে যাচ্ছি। তোরা কিন্তু আর এ বাড়িতে থাকিসনে। যত শীগ্‌গির পারিস, এ বাড়ি ছেড়ে দিস। তোর জয়জয়কার হোক।'

মার শেষ আশীর্বাদ পেলাম, কিন্তু মাকে ফিরে পেলাম না। জন্মের মতোই তাঁকে হারালাম।

তেরো দিনের মধ্যে মার শেষকৃত্য শেষ হ'লো। মধ্যে একটা কথা বলতে ভুলেছি। আমাদের নতুন বাসার পাঁচীলের গায়ে একটা দরজা ছিল, সেটা খুলে কলকাতা শহরের মেয়র নির্মল চন্দ্র মহাশয়ের বাড়ি যাওয়া যেতো। চন্দ্র মহাশয়ের সঙ্গে পূর্ব থেকেই আমার জানাশুনা ছিল। মার মৃত্যুর দিন থেকে তাঁর শেষকৃত্য পর্যন্ত সব কয়দিনই চন্দ্র মহাশয় ও তাঁর জননী—'মা-মণি' (সকলেই তাঁকে 'মা-মণি' বলে ডাকে) আমাদের সব কিছু দেখাশুনা করেছেন। নির্মল চন্দ্র ও আমার এক ডাক্তার ভাইএর চিঠি নিয়ে উড স্ট্রীটে সে সময়ের সুবিখ্যাত চক্ষুচিকিৎসক সুশীল মুখুজ্যের বাড়ি যাই। আমার চোখ

পরীক্ষা ক'রে তিনি বললেন, আর কিছুই নয়, দুই চোখের মণির উপর দুটি বসন্ত হয়েছে, কিছুদিন আর বিলম্ব করলে চোখ দুটি একেবারেই নষ্ট হ'তো।

কি ভয়ানক !

যা হোক, তিনি একটা মলম ও কয়েকটা ওষুধ দিলেন। মাসখানেক নিয়মিত প্রয়োগ করায় চোখ আমার ভালো হ'য়ে যায়। সুশীল মুখুজ্যের চিকিৎসায় সারলেও আমি মনে করি, নিজের জীবন দিয়ে মা-ই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছেন।

মার মৃত্যুর পর পনেরো দিন কেটে গেছে। মা-মণির কাছে সব কথাই আমরা খুলে বলেছি। তিনিও বলেছেন, এমন অবস্থায় এ বাড়িতে থাকা আর সমীচীন নয়। আর একটা নতুন বাসাও দেখা হ'য়ে গেছে।

কাল সকালেই আমরা চলে যাবো। রাত্রি দশটা পর্যন্ত মা-মণি আমাদের সঙ্গে নানা গল্প-গুজব ক'রে চলে গেছেন। আজ রাত্রিতে সকলেই আমরা এক ঘরে আছি, জিনিসপত্র সব গোছানো হ'য়ে গেছে। বৃষ্টি হবে। রাতটা কাটলে হয়! অবশিষ্ট প্রাণ ক'টি নিয়ে এখন ভালোয় ভালোয় বেরুতে পারলে বাঁচি। আকাশে মেঘ করেছে। কেমন একটা গুমোট পড়েছে। ঘরে আলো জ্বলছে, মার মৃত্যুর পর থেকে প্রত্যহই জ্বলে থাকে। ছেলেরা ছাড়া আমাদের কারো চোখে আজ নিদ্রা নেই। রাত দু'টো হলো বোধহয়। এমন সময় ছাদের উপর থেকে একটা

উচ্চ হাসির শব্দ ভেসে এলো।

স্ত্রী চীৎকার ক'রে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। 'ভয় কি? ভয় কি?' বলে আমিও চেঁচিয়ে উঠলাম। বিধবা বোন 'দুর্গা, দুর্গা! রাম, রাম!' বলতে লাগল। শহর নিশুতি। একবার মেঘের ডাক শোনা গেল। বোধ হয় বৃষ্টি হবে। রাতটা কাটলে হয়! কাল সকালেই আমরা চলে যাবো!

অবনীন্দ্রনাথের রোগমুক্তি

চিত্তরঞ্জন দেব

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন দেশে বিদেশে তাঁর গুণগ্রাহীরা। পত্র-পত্রিকায় ঘোষিত হল তাঁর সাধনায় ও সিদ্ধির কথা। আমি বলবো এখানে তাঁর জীবনের এমন একটি ঘটনা—তাঁর বুদ্ধিও যার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি।

একবার হঠাৎ তিনি আক্রান্ত হলেন পেটের যন্ত্রণায়। দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছিল। পেট থেকে বুক অবধি ভিতরে কে যেন অগ্নিশূল ঢুকিয়ে দিয়েছে। ছট্‌ফট্‌ করছিলেন তিনি। তারপর জ্ঞান

হারিয়ে ফেলেছিলেন কিছুক্ষণ।

ডাক্তার ডাকা হল। পর পর চারজন ডাক্তার এলেন। একযোগে পরামর্শ করে চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সকালের দিকে কম থাকলেও বিকেল এলেই আর রক্ষে থাকে না। বিকেল হয়ে আসছে শুনলেই ভয়ে রোগীর মুখ বিবর্ণ হয়ে আসে। স্টেশনে যেমন ট্রেন আসার ঘণ্টা বাজে, এই বিকেল-আসা মানেই পেটে যন্ত্রণা শুরু হওয়ার ঘণ্টা। রোগী অস্থির হয়ে ওঠেন।

বাড়িসুদ্ধ সকলে নিরুপায় হলেন। সেদিন আবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে যন্ত্রণা। এবার সকলে অন্ধকার দেখছেন।

ছেলে-মেয়ের বাপ একজন স্বাস্থ্যবান পুরুষমানুষ পেটের ব্যথায় চিৎকার করে কাঁদছেন—'গেলুম, গেলুম।'

মেয়েরা এসে জড়িয়ে ধরে বাবাকে। তাদের চোখেও জল। বাবা বুঝি আর বাঁচেন না।

ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে, হচ্ছে। তবু যন্ত্রণা কমে না। চিৎকার থামে না। ডাক্তাররা কাছেই বসা। তবু উপায় হচ্ছে না কিছু।

দেওয়া হয়েছে মরফিয়া ইন্‌জেক্‌শন পর পর দুটো—সকালে আর দুপুরে। তারপর রাত দশটা বাজে—তখনও একফোঁটা ঘুম নেই চোখে। রোগী কাতর স্বরে বলছেন, 'আর যা-হোক, একটু ঘুম পাড়িয়ে দিন আমায়। পারছি না আর সইতে।'

ডাক্তাররা ত হতবুদ্ধি। বলছেন,—'ছুটো মরফিয়া দিলে হাতি ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু এ-যে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি নে।'

তবু আরেকটা মরফিয়া দিয়ে ডাক্তাররা বিদায় নিলেন। বলে গেলেন—'এখন যা করেন ঈশ্বর।'

অনেক রাত তখন। আপনারজনরা কাছে বসে সবাই আকাশ-পাতাল ভাবছেন। রোগীর কি মনে হল, ওঁদের ডেকে বললেন, 'সবাই চলে যাও এ-ঘর ছেড়ে, আমি আজ একলা থাকব।'

রোগীর মেজাজ ঠিক রাখা দরকার। ওঁরা তাই উঠে গেলেন। ক'দিন ধবে ঘুম নেই দিনে-রাত্তিরে ওঁদের। যে-যার ঘরে গিয়ে বিছানায় গা ছেড়েছেন আর ঘুম এসে জড়িয়ে ধরেছে।

আর কেউ জেগে নেই রোগী ছাড়া।

মস্ত বড়ো বাড়ি—একেবারে নিস্তব্ধ। এমন রাত্তিরে কে বিশ্বাস করবে যে, এইটেই সেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি!

চোখ বোজবার জন্য ওষুধ যাঁকে দেওয়া হল—তাঁর চোখই শুধু খোলা। বড় বড় ছু'চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন যন্ত্রণা-কাতর অবনীন্দ্রনাথ সেই গভীর রাত্রির নিঃসঙ্গতার মধ্যে।

চেয়ে চেয়ে দেখছেন তিনি—মশারিটা কাঁপছে, কাঁপতে কাঁপতে সরে পড়েছে কোথায়! দেয়াল কাঁপছে ঘরের। কাঁপতে কাঁপতে দূরে চলে যাচ্ছে। জ্বলন্ত উনানের উপর গরম হাওয়া

যেমন কাঁপে, যেমন কাঁপে তুপুর রোদে দূরের মাঠে মরীচিকা—ঠিক তেমনি। চোখের সম্মুখে যা আছে তা-ই কাঁপছে। এখন ইচ্ছে করলেই ঘরের দরজা না-খুলেও যেদিকে খুশি বেরিয়ে পড়া যায়! কোনো দিকেই আর বাধা নেই কিছু। চারদিকেই আকাশ নেমে এসেছে!

ভোর হয়ে এলো বুঝি! চোখ লাগেনি তখনও। বড় বড় চোখে তাকিয়েই আছেন রোগী। হঠাৎ দেখেন চোখের উপর একখানি হাত—যেন মশারির ও-পার থেকে নেমে এসেছে।

চিনতে পারলেন। এ হাতখানি অবনীন্দ্রনাথের মায়ের। মা বলছেন,—'কোথায় ব্যথা? এইখানে?'

বলেই হাতটি লাগালেন রোগীর বুকের ঠিক সেই-খানটাতে—যেখানে ছিল তুঃসহ যন্ত্রণা। বলছেন নিজের মুখেই অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রুতিধরী রাণী চন্দকে।

'সমস্ত শরীরটা যেন চমকে উঠলো, ভালো করে চারদিকে তাকালুম, কেউ কোথাও নেই। ব্যথা? নড়ে চড়ে দেখি—তাও নেই। অসাড় হয়ে শুয়েছিলুম, নড়বার শক্তিটুকু ছিল না একটু আগে—সেই আমি বিছানায় উঠে বসলুম। কি বলব, নিজের মনেই কেমন অবাক লাগলো।'

বিছানা ছেড়ে উঠলেন তিনি তখনই। ধীরে ধীরে বাইরে এলেন। শরীরে অসুখের রেশটুকুও নেই। অসুখ কখনও হয়েছিল—এমনও মনে হচ্ছে না। যেন একটা স্বপ্ন দেখার

পর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি তা'হলে অসুস্থ হয়ে পড়েননি আসলে? তা'হলে এই ডাক্তার, ওষুধ, মরফিয়া, আত্মীয়-স্বজনের ভিড়, চিৎকার, ও-সব কি?

স্পষ্ট চোখে লেগে আছে মায়ের হাতখানি। বুকের সেই জায়গাটা হাতে ধরে একবার অনুভব করলেন—যেখানে মা তাঁর হাত বুলিয়ে দিয়ে গেলেন এসে। সে কি ভুলতে পারেন?

আবার ভাবলেন—মা নেই তো, মায়ের হাত আসবে কোথা থেকে?

তবু তো সত্যি সত্যি এসেছিল—তা নইলে ব্যথা আরাম হলো কেমন করে?

কূল-কিনারা পান না ভেবে ভেবে। তবু এটুকু বুঝতে পারেন—তাঁর শরীরে আর ব্যথা-যন্ত্রণা কিছু নেই।

তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন ঘর থেকে। চাকর শুয়েছিল দরজার কাছে। সে ধড়মড় করে উঠে পড়লো। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন না তো? অসুখ হলে এমনধারা হয় কিন্তু! এর মধ্যেই চাকরের কানে এলো সুস্থ মানুষের কণ্ঠস্বর, 'চুপ কাউকে ডাকিসনে। চুপচাপ একটু ঠাণ্ডা জল দে দেখি আমার হাতে।'

মুখে মাথায় বেশ করে ঠাণ্ডা জল দিয়ে নিলেন। আবার তক্ষুণি চাইলেন চাকরের কাছে—এক পেয়ালা চা, আর বেশ করে মাখন-মাখানো দু'খানি পাউরুটি টোস্ট-করা।

যেখানে বসে ছবি আঁকেন—বাইরের বারান্দায়—সেখানে বসেই খেলেন গরম চা আর রুটি। তারপর গড়গড়ার নল মুখে লাগিয়ে টানতে শুরু করলেন।

পাঁচটা বেজেছে। তেতলার সিঁড়ি থেকে রোগীকে দেখতে পেয়েছেন তাঁর দাদা। অবাক হয়ে বলছেন তিনি, 'এ কি, তুমি যে বাইরে এসে বসেছ?'

উত্তর দিলেন, 'ভালো হয়ে গেছি, দাদা।'

তাঁর দুই মেয়ে নেলি ও করুণা তাদের মাকে সঙ্গে নিয়ে এসে দেখে—বাবা বিছানায় নেই। এ-ঘর খোঁজে, ও-ঘর খোঁজে, শেষকালে যখন দেখতে পায় বারান্দায়—তখন সে কি ভীষণ চেঁচামেচি! সকলে একসঙ্গে বলে ওঠে, 'এখানে আবার কখন এলে? একটু জানতেও পারিনি আমরা।'

বললেন, 'জানবে কি করে? আমি যে ভালো হয়ে গেছি একেবারে। আর ভাবতে হবে না তোমাদের।'

এমন সময় তাঁর ডাক্তার মহেন্দ্রবাবু এসে হাজির। রোগী দেখেই তিনি চমকে উঠে থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ থেকে কোনো কথা বেরুবার আগেই রোগী বললেন, 'আর আপনাদের দরকার নেই।'

ডাক্তার হেসে বললেন, 'ভালো কথা। সেরে উঠেছেন তা'হলে!'

আবার কার খট্‌মট্ জুতোর শব্দ? ডাক্তার ব্রাউন এলেন। রোগীকে এমন সুস্থ দেখে অবাক হলেন তিনিও। কুশলপ্রশ্ন

জিজ্ঞেস করতে করতে হাত বাড়িয়ে দিলেন। অবনীন্দ্রনাথ সেক হ্যাণ্ড করে বললেন, 'গুডবাই, ডাক্তার।'

সাহেব হাসিমুখে বিদায় নিলেন।

এত বড়ো ব্যাধিটা—সারলো কিনা কে জানে—অথচ রোগী ফিরিয়ে দিচ্ছেন একে একে সব ডাক্তারকেই! মনে হঠাৎ খটকা বাজলো। কি যেন ভাবছেন!

এমন সময় এলেন আরেক ডাক্তার—অমরনাথ। হোমিও-প্যাথ। রোগীর দুশ্চিন্তা কমলো। বললেন, 'একটু হোমিও-প্যাথি দিয়ে যাও, রেখে দি, যদি ব্যথা ওঠে তো খাবো।'

ডাক্তার বললেন, 'নিশ্চয়ই, আমি এক্ষুণি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

অমরবাবু উঠলেন—আর ঢুকলেন এসে ডাঃ ডি, এন রায়। বুড়ো হয়ে গেছেন। অবনীন্দ্রনাথের মায়ের চিকিৎসক ছিলেন তিনি। অবনীন্দ্রনাথের শক্ত অসুখ শুনে দেখতে এসেছেন। বলছেন, 'হবে না লিভার ব্যথা? এই বয়সে এতগুলি বই লেখা?'

—'এতগুলি বই কোথায়?'

'তা নয় তো কি? বাড়ির মেয়েরা সেদিন পড়ছিলো, দেখলুম যে আমি।'

—'সে তো মাত্র দু'খানি—শকুন্তলা আর ক্ষীরের পুতুল!'

'ওই হল। দুইখানা বই লিখেছ, এত এত ছবি এঁকেছ—তোমার লিভার পাকবে না তো পাকবে কার?'

কিন্তু লিভার পাকুক আর যাই হয়ে থাকুক—এখন তো সব সেরে গেছে। সেই যে মায়ের হাতের ছোঁওয়া লাগলো বুকে—কোথায় গেল ব্যথা-যন্ত্রণা চোরের মতো পালিয়ে? গণ্ডা গণ্ডা ডাক্তার একটু ঘুম পাড়াতে পারলো না—কোথা থেকে একখানি হাত এসে নিয়ে গেলো সকল ব্যাধি ছোবল মেরে।

এ কি করে হলো—কেউ বলতে পারবেন? অবনীন্দ্রনাথ শুধু বলেছেন—'কি বলব, নিজের মনেই অবাক লাগলো।'

অদৃশ্য হস্ত

নলিনী ভদ্র

জীবনের দীর্ঘকাল কেটেছে ভবঘুরেমি করে। এই ভবঘুরে জীবনে এমন কতকগুলো বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছে, যার তাৎপর্য বুঝতে গিয়ে বিচারবুদ্ধি হার মেনেছে। আসাম ও সিংভূমের হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য পর্বতে বিচরণকালে একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি যেন এক অদৃশ্য হস্ত আমাকে সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করছে। চরম বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই উদ্যত কল্যাণ হস্তের অস্তিত্ব সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করেছি।

কিন্তু অল্প বয়সে একবার আর এক অদৃশ্য হস্ত আমাকে ঠেলে দিয়েছিল নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে। সে ঘটনার পর দীর্ঘকাল কেটে গেছে, কিন্তু যখনি তা স্মৃতিপথে সমুদিত হয়, তখনি যেন দেহে সেই অদৃশ্য হস্তের স্পর্শ নূতন করে অনুভব করি, সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

ঘটনাটা সম্বন্ধে মনে মনে অনেক আলোচনা বিচার-বিতর্ক করেছি, কিন্তু এটা আমার নিকট রহস্যময় হয়েই রইল। শেষ পর্যন্ত 'দেয়ার আর মোর থিংস্‌ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ...' মনে মনে মহাকবির এই বচন আউড়ে মস্তিষ্ককে অনাবশ্যক ক্লান্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবার প্রয়াস পেয়েছি।

ত্রিশ একত্রিশ বছর আগেকার কথা। শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ শহরে পিসে মশাইয়ের বাসায় থেকে তখন ইংরেজী স্কুলে পড়ি। বয়স হবে ষোলর কাছাকাছি। সবে ক্লাস এইট থেকে পরীক্ষা দিয়ে নাইন-এ উঠেছি, এমন সময় অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ এসে আমাদের ক্ষুদ্র শহরটিতে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। সেই আন্দোলনের আবর্তে পড়ে আমরা প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন ছাত্র একই দিনে স্ট্রাইক করে স্কুল থেকে বেরিয়ে এলাম।

আবার যাতে স্কুলে ফিরে যাই সেজন্যে পিসেমশাই সাধ্যমত চেষ্টা করলেন। উপদেশ হুমকি প্রহার সব কিছুই চলতে লাগল ওভারডোজে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থমনোরথ হয়ে তিনি বাবাকে আসবার জন্যে চিঠি লিখলেন।

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না

বাবা সিলেটের করিমগঞ্জ মহকুমার কালিকাবাড়ি বলে এক চা-বাগানে চাকরি করতেন—সেখানে তিনি একলাই থাকতেন—আর মা থাকতেন বাড়িতে আমার অন্য ভাইবোনদের নিয়ে।

আমি স্ট্রাইক করার তিন চারদিন পরেই বাবা হবিগঞ্জে এসে পৌঁছলেন। আমার মতিগতি দেখে বাবা স্থির করলেন যে, এখানকার এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে কিছুকাল রাখবেন।

স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে অবধি বেশ একটা অনাস্বাদিত-পূর্ব মুক্তির আনন্দ অনুভব করছিলাম। বাবার মুখে কালিকা-বাড়ি যাত্রার প্রস্তাব শুনে আনন্দের মাত্রা যেন সহস্র গুণ বেড়ে গেল। পিতা-পুত্র রাত্রে সায়েস্তাগঞ্জ স্টেশনে এসে ট্রেনে চাপলাম। জীবনে সেই প্রথম বিদেশ যাত্রা, রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে ট্রেন যখন প্রচণ্ড বেগে চলতে লাগল, তখন গতির আনন্দে আমার তরুণ মনে দোলা লাগল—একটা কথাই শুধু মনে হতে লাগল যে, এ যাত্রার অবসান যেন কখনো না হয়।

কিন্তু আমার স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে যাত্রার অবসান হল পরদিন সকালে ট্রেন লাতু স্টেশনে পৌঁছলে পর। কিন্তু স্টেশনে নামবার পর অনতিদূরবর্তী শ্যামলবনানীশোভিত পাহাড়ের মালা চোখে নূতন স্বপ্নমায়ার সৃষ্টি করল। পাহাড় প্রথম দৃষ্টিতেই আমার মন হরণ করলে।

স্টেশন থেকে মাইল চারেক হেঁটে আমরা চা-বাগানে বাসায়

এসে পৌঁছলাম। বৃক্ষলতাহীন উঁচু একটি টিলার একেবারে শীর্ষদেশে খড়ে ছাওয়া বাংলো প্যাটার্ণের প্রকাণ্ড দু'খানি ঘর—এইটেই হচ্ছে আমাদের বাসাবাড়ি। টিলার উপর থেকে নিচের দিকে তাকালে সুদূর প্রসারিত সুবিন্যস্ত চা-বাগানের শ্যামলিমা চোখ জুড়িয়ে দেয়।

বাবা সারাদিন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন—তাই এখানে এসে আমি লাভ করলাম অখণ্ড স্বাধীনতা। ভোরবেলা বাবা কাজে বেরিয়ে গেলেই টিলা থেকে নেমে শুরু করি চা-বাগানের ভেতর দিয়ে যদৃচ্ছা বিচরণ। কুলি-কামিনদের বস্তী ছাড়িয়ে অগভীর পাহাড়ী 'ছড়া'র (ছোট নদী) তীরে বালু শয্যার উপর সটান শুয়ে পড়ি। চারদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু চা গাছ আর চা গাছ—কোথাও মনুষ্য বসতির চিহ্নমাত্র নেই। একটা অতলস্পর্শ নীরবতা সমস্ত অন্তরকে কেমন যেন মোহাবিষ্ট করে ফেলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাহাড়ী নদীর তীরে কাটিয়ে ফিরে আসি বাসায়।

এমনিভাবে কেটে গেল মাস দুই—বাবা একদিন বললেন যে, তিনি আমাকে করিমগঞ্জে কাকাবাবুর বাসায় রেখে আসবেন—সেখানে নাকি আমাকে আবার স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হবে। করিমগঞ্জ যাত্রার দিনও স্থির হয়ে গেল। এমন সময় এমন একটা ব্যাপার ঘটল যাতে সব উলট-পালট হয়ে গেল।

বাবা ছিলেন সিলেটের সাপ্তাহিক 'জনশক্তি' পত্রিকার গ্রাহক আর আমি ছিলাম সেই পত্রিকার অক্লান্ত পাঠক। এই

পত্রিকার মারফতেই বাইরের জগতের একটু-আধটু খবর পেতাম। 'জনশক্তি' পত্রিকার এক সংখ্যায় খবর বেরুল মহাত্মা গান্ধী সদলবলে আসাম সফরে বেরিয়েছেন। অমুক তারিখে সুরমা মেলে তিনি শিলচরে গিয়ে পেঁাছবেন। সুরমা মেল লাতু স্টেশনে এসে পেঁাছয় রাত আটটার সময়। সংবাদটা পাঠ করে প্রাণটা আনন্দে নেচে উঠল। মহাত্মাজীর দর্শন লাভ করবার দুর্লভ সৌভাগ্য যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে এসে উপস্থিত হবে তা ছিল কল্পনারও অতীত। মনে মনে স্থির করলাম, বাবাকে না জানিয়ে সন্ধ্যার আগেই বরাবর স্টেশনে চলে যাব। এখন শুক্লপক্ষ। রাত্রে জ্যোৎস্না উঠবে সুতরাং ফিরতে কোনোই অসুবিধা হবে না। আর এখানকার বনভূমির সঙ্গে আমার মনের মিতালি হয়েছিল—অকুতোভয়ে আমি এখানকার অরণ্য পর্বতে ঘুরে বেড়াতাম—বহুদিন রাত্রে স্টেশন থেকে নির্জন বনপথ অতিক্রম করে একলা বাসায় ফিরে এসেছি—ভয় ডরের লেশমাত্রও মনে উদিত হয়নি।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্টেশনে পৌঁছে অধীর আগ্রহে আটটার ট্রেনের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। ট্রেন যথাসময়ে এসে স্টেশনে পৌঁছল। কিন্তু আমার এত আগ্রহাকুল প্রতীক্ষা ব্যর্থ হল—সে-ট্রেনে এলেন না মহাত্মা গান্ধী। বড় আশা করে নিরাশ হওয়ার দুঃখ যে কি সুতীব্র তা এর পূর্বে এমন মর্মান্তিকভাবে উপলব্ধি করিনি। কিন্তু সে রাত্রে অদৃষ্টে যে আরো কত বড় দুর্গতি লেখা ছিল, তা কি তখন জানতাম!

ট্রেন চলে যাওয়ার পর উদাস মনে স্টেশনে বসে রইলাম। এমনিভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে চা-বাগানের পথে পা চালিয়ে দিলাম।

লোকাল বোর্ডের রাস্তা ধরে অনেকক্ষণ চলে অবশেষে চা-বাগানের শুঁড়ি পথের উপরে এসে পড়লাম। আকাশে খণ্ড চাঁদ—অস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে দু'ধারের দূর-বিসর্পিত চা-বাগান রহস্যময়।

পথ চলেছি আপন মনে—হঠাৎ ডান কাঁধের উপরে একটা মৃদু স্পর্শ অনুভব করলাম—হিম শীতল ক্লেদার্দ্র স্পর্শ। ঠাণ্ডা পাঁচটি আঙুল দিয়ে কে যেন অত্যন্ত মৃদুভাবে আমার কাঁধের উপর চাপ দিলে। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল গলানো বরফের স্রোত যেন আমার মেরুদণ্ডের শীর্ষদেশ থেকে ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা এমনি আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত যে রীতিমত চমকে উঠলাম। ভূতের ভয় আমার ছিল না, কিন্তু এই অসময়ে অস্থানে কেউ যে আমার পেছন থেকে কাঁধে হাত দিয়ে ইয়ার্কি করতে আসবে তাও তো অসম্ভব। ব্যাপারটা কি দেখবার জন্যে বিদ্যুৎবেগে পিছন ফিরে তাকালাম। কিন্তু কিছুই নজরে পড়ল না। জ্যোৎস্নাবিধৌত বনভূমি শান্ত স্থির অচঞ্চল, চা গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে না।···এ কিছু নয়, মনের ভুল মাত্র ভেবে আবার পথ চলতে লাগলাম, কিন্তু আশ্চর্য, কয়েক পা এগোবার পরেই দেহের ঠিক একই স্থানে সেই তুহিন-শীতল স্পর্শ। কিন্তু

স্পর্শ এবার মৃদু নয়, সেই অদৃশ্য হস্ত প্রথমে লম্বা লম্বা আঙুল-গুলো দিয়ে আমার কাঁধের উপর মারলে এক থাপ্পড়, তারপর পেছন থেকেই বজ্রমুষ্টিতে আমার ঘাড় আঁকড়ে ধরে আমার গতিরোধ করলে। এবার দস্তুর মত ভড়কে গেলাম, আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল—শরীরের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল, মাথার ভেতর দিয়ে যেন কিসের স্রোত বয়ে যেতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ যেন হাওয়ার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে প্রচণ্ড এক ঝট্‌কায় নিজেকে সেই অদৃশ্য হস্তের কবল থেকে মুক্ত করে নিয়ে পিছন ফিরে তাকালাম, কিন্তু এবারও কিছু চোখে পড়ল না—চরাচর তেমনি নৈঃশব্দের ক্রোড়ে সুপ্তিমগ্ন।

এবার নিদারুণ আতঙ্কে সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল—দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগলাম। স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলাম দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির মত সেই অদৃশ্য হস্ত আমার অনুসরণ করছে—মাঝে মাঝে কাঁধের উপর পড়ে প্রচণ্ড চপেটাঘাত আর প্রবল আকর্ষণে গতি হয় ব্যাহত—সে যে কি অস্বস্তিকর অনুভূতি!

রাস্তা ছাড়িয়ে কখন যে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটতে শুরু করেছি টের পাইনি। আশেপাশে ডাইনে বাঁয়ে ছেদহীন নিবিড় জঙ্গল। বুঝলাম পথ হারিয়েছি—কোন্‌দিকে গেলে যে পথের রেখা খুঁজে পাব, তাও বুঝতে পারছি না—কেমন যেন আচ্ছন্ন অভিভূতের মত সুমুখের পানে ছুটে চলেছি—টের পাচ্ছি পেছনে তাড়া করে আসছে গোটা মানুষ নয়, একখানা অদেখা

হাত।...

চা গাছের জঙ্গল মাড়িয়ে অবিশ্রান্ত ছুটে চলেছি, বন ক্রমে নিবিড়তর হয়ে আসছে। নিষ্ক্রমণের পথ বুঝি চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেল—মনে হল অনন্তকাল আমার এই অরণ্য মধ্যে এমনি ভাবে উল্কাগতিতে ছুটতে হবে—এ গোলক ধাঁধার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ এ জীবনে ঘটবে না।

ছুটতে ছুটতে চা বাগান ছাড়িয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে দেখি সামনে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে উঁচু এক টিলা—টিলার পাদদেশে থমকে দাঁড়ালাম—চারদিকে মৃত্যুপুরীর নিস্তব্ধতা—এ কোন্ অচিন দেশে এসে পৌঁছেছি?

টিলার তলায় দাঁড়িয়ে আছি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে, হঠাৎ কাঁধের ওপর অনুভব করলাম আর একবার প্রচণ্ড ধাক্কা, সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক যেন যন্ত্রচালিতের মত টিলা বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম—খানিক দূর উঠবার পরই দেখি লতাগুল্মজালে জ্যোৎস্নালোকের প্রবেশপথ অবরুদ্ধ—উপরে নিচে ডাইনে বাঁয়ে কি নিবিড় অন্ধকার। এ অন্ধকার যেন একটা জীবন্ত সত্তার মত আমাকে তার জঠরে জীর্ণ করতে উদ্যত। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে একান্ত অসহায়ভাবে অদৃষ্টের হাতে আত্মসমর্পণ করে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলাম—বুঝতে পারলাম যে আমার চলৎশক্তি পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই টের পেলাম সেই অদৃশ্য হস্ত আমার পিঠের উপর ধাক্কা মারছে আর লতা-গুল্ম মথিত করে আমি একটু একটু করে সামনের দিকে এগিয়ে

চলেছি, তারপর কেমন করে যে টিলার শীর্ষদেশে গিয়ে পৌঁছলাম এবং উতরাই বেয়ে ওপারে নিচে এসে নামলাম তা আজও আমার নিকট রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে।

এতক্ষণ ছিলাম কেমন যেন মোহাবিষ্ট অবস্থায়—টিলার এপারে নিচে নেমে এসে আবার যেন আত্মসম্বিৎ ফিরে পেলাম, সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করলাম বাঁচবার জন্যে একটা প্রবল প্রেরণা—ঝোপ-ঝাড়ের উপর দিয়ে ছুটতে লাগলাম ঊর্ধ্বশ্বাসে।

হঠাৎ দূরে নজরে পড়ল কুলিকামিনদের বস্তির সারি সারি ঘর—একটি কুটীর থেকে আলোর রেখা এসে পড়েছে বাইরে গাছপালার উপরে—মৃত্যুর অন্ধকার পটে ফুটে উঠল যেন চির-জয়ী প্রাণের প্রদীপ্ত মহিমা। আশায় আনন্দে প্রাণ নেচে উঠল—কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব চড়িয়ে আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'বাঁচাও!' সঙ্গে সঙ্গেই 'পার্টিং কিক', পিঠের উপর সেই অদৃশ্য হস্তের প্রচণ্ডতম ঝাপ্টা—মনে হল আমার দেহের হাড়গোড় চূর্ণ হয়ে গেল বুঝি। মাথা প্রবল বেগে ঘুরতে লাগল। চোখের সামনে থেকে পৃথিবীটা যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে, সারা শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগল—সম্বিৎ হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম।

পরদিন বিকেল নাগাদ যখন চেতনা ফিরে এল, তখন দেখি চা-বাগানে আমাদের বাসায় বিছানায় শুয়ে আছি—সারা দেহ জ্বরের তাড়সে যেন একেবারে জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে, বাঁ-কাঁধে অসহ্য যন্ত্রণা। শয্যাপার্শ্বে যন্ত্রপাতি হাতে বাগানের ডাক্তারবাবু

উপবিষ্ট, শিয়রে বাবা উদ্বেগাকুল আসনে বসে একদৃষ্টে আমার মুখের পানে তাকিয়ে আছেন। দোরগোড়ায় বাগানের সর্দার এবং অন্যান্য কয়েকজন কুলী বসে আছে।

শুনলাম, কাল শেষ রাত্রে বাগানের দক্ষিণতম প্রান্তের কুলি-বস্তীর নিকটে জঙ্গলের ভেতর থেকে হঠাৎ এক প্রচণ্ড আর্তনাদ শুনে সর্দারজী নাকি লোকজনসহ বেরিয়ে এসে দেখতে পায় যে, একটা ছড়ার পাশে আমি মূর্ছিত অবস্থায় পড়ে রয়েছি—তারপর আমাকে পাঁজাকোলা করে সে জায়গা থেকে সরাসরি বাংলোয় নিয়ে আসে।

জ্বর ক্রমে ক্রমে গুরুতর আকার ধারণ করতে লাগল—দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা কেমন যেন আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকতাম, আর বিভীষিকা দেখতাম—মনে হত, প্রচণ্ড খড়্গের আঘাতে কে যেন আমার মুণ্ডটাকে কেটে ফেলেছে, আর সেই ছিন্ন মুণ্ড যেন উল্কাবেগে কোন অনির্দেশ্য পথে ছুটে চলেছে,. আর সর্বোপরি সকল সময় কাঁধের উপর অনুভব করতাম, সেই অদৃশ্য হস্তের ক্লেদার্দ্র স্পর্শ।

ছয়মাস সেই দুঃসহ নরক যন্ত্রণা ভোগ করবার পর অবশেষে রোগমুক্ত হই। সবাই আমার জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন—রোগ সেরে যাওয়ার পর আমার যেন পুনর্জন্ম লাভ হয়।

মৃতের প্রতিশোধ

স্নুচেতা গুপ্ত

আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করি—আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা বিজ্ঞানের বেড়াজালে স্থনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু এখনও এই প্রকৃতির রাজত্বে এমন কতকগুলি অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটতে দেখা যায় যেগুলোকে বুদ্ধির দ্বারা বা বিজ্ঞানের দ্বারা সত্যিই ব্যাখ্যা করা চলে না। সম্প্রতি এই বাঁকুড়া সহরের বুকে এমন একটি ঘটনা ঘটে গেল যাতে আমি—আমিই বা বলি কেন যাঁরা এ-বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী তাঁরাও সকলে হতবুদ্ধি হয়েছেন।

সংক্ষেপে ঘটনাটা বলি।

বাঁকুড়া সহরের পশ্চিম দিকে যে রাস্তাটা রাজগ্রাম ও বাঁকুড়াকে সংযুক্ত করেছে তার মধ্যে একটা রেলওয়ে পুল আছে। এই পুলটি পেরিয়ে সহরে ঢোকা যায়। লোকমুখে এই পুলটি 'বড় পুল' বলে পরিচিত। এই 'বড় পুলে'র পশ্চিম দিকে এক অতি প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ তার দীর্ঘ শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে। এই গাছের কোলে একটি ছোট্ট মন্দির। দেবতার নাম বাবা ভৈরব। মন্দিরে ঠাকুর বলতে কিছুই নেই— কেবল কতকগুলি মাটির পোড়ান ঘোড়া, কয়েকটি চাঁদমালা। মন্দিরের চারদিক সিঁদূর রঞ্জিত। রোজ সন্ধ্যায় এইখানে পূজারী ভক্তবৃন্দকে পূজা দিতে দেখা যায়। জায়গাটি বেশ নির্জন ও মনোরম। তাই ধারেপাশে যাঁরা বাস করেন তাঁরা বেড়াতে বের হলে বাবা ভৈরবের কাছে হাজির হন এবং বাবার সামনে শানে বাঁধান বারান্দায় (এ বারান্দাটি পূর্বে ছিল না— সম্প্রতি হয়েছে) খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে সমস্ত দিনের গ্লানি ঝেড়ে মুছে বাবা ভৈরবের পাদপদ্মে সমর্পণ ক'রে তাঁকে প্রণাম নিবেদন ক'রে ঘরে ফিরে আসেন। এই পথ দিয়ে গ্রামাঞ্চল থেকে অনেক পথিককে নানা কাজে সহরে আসতে হয়। সহরে প্রবেশ করবার পুর্বে তারা বাবা ভৈরবকে প্রণাম ক'রে কার্য-সিদ্ধির জন্য 'মানসিক' জানিয়ে আসে। ফেরবার পথে বাবাকে যার যা সামর্থ বাবার মন্দির সংলগ্ন ধন-ভাণ্ডারের ফুটো দিয়ে গলিয়ে দেয়। এই ভৈরব খুবই জাগ্রত দেবতা বলে লোকমুখে প্রসিদ্ধি আছে। শোনা যায় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যখন প্রথম

লাইন বসান তখন সে লাইন ভৈরবের মন্দিরের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, প্রত্যেক রেল ইঞ্জিন ঠিক ভৈরবের সামনে এসে থেমে যেত—কিছুতেই আর চলত না। অবশেষে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হ'য়ে লাইন সরিয়ে নেন—আর পাঁঠা বলি দিয়ে পূজো ক'রে বাবা ভৈরবকে শান্ত করেন। তদবধি রেল চলাচলে আর কোন বিঘ্ন ঘটে না। সেই সময় থেকে বাবা ভৈরব রেলওয়ে সম্পত্তিতেই রাজত্ব পেতেছেন এবং বাবার ভক্তের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে।

উপরোক্ত ঘটনাবলীর মধ্যে কতটুকু যে সত্য আছে—রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ লাইন সরিয়ে বাবাকে পাঁঠাবলি দিয়ে পূজা ক'রে শান্ত ক'রেছিলেন কিনা—তা তদন্ত সাপেক্ষ। কিন্তু একটা ব্যাপার বাবা ভৈরবের গণ্ডির মধ্যে প্রায়ই ঘটে থাকে তা সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন। সেটি আর কিছু নয়, রেলে মানুষ চাপা পড়া। এমন বছর নেই যে বছর বাবার এই গণ্ডির মধ্যে একটি বা দু'টি মানুষ চাপা না পড়ে। এই চাপা পড়ার আবার রকমফের আছে। কেউ জীবনে অশান্তির বোঝা বইতে না পেরে ট্রেনের চাকায় গলা দিয়ে আত্মহত্যা করে আবার কেউবা অসতর্ক ভাবে চলতে গিয়ে চাপা পড়ে। যে বছর কোন মানুষ কাটা না যায়—সে বছর কয়েকটা গরু কিম্বা ছাগল রেলে চাপা পড়বেই। রেলওয়ে লাইন সহরের প্রান্তদেশ দিয়ে অনেকটা পথ গিয়েছে—কিন্তু আর কোন জায়গায় দুর্ঘটনা না ঘটে এই বিশেষ জায়গাটিতে অর্থাৎ ভৈরবের গণ্ডির

(ভৈরবের মন্দির থেকে দক্ষিণে ২০০ হাতের মধ্যে লাইন ধ'রে একটা শিরীষ গাছ পর্যন্ত ভৈরবের গণ্ডি) মধ্যেই ঘটে কেন, সেটা সত্যিই বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না। এখানে কোন দুর্ঘটনা ঘটলেই লোকে বলাবলি করে, 'বাবা ভৈরব নিলেন।' কিন্তু বাবা ভৈরব সত্যিই নেন কিনা, নর-রক্তে ভৈরবের তৃপ্তি হয় কিনা—তার উত্তর পাওয়া যায় না।

কিছুদিন আগে এমনি একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছুটতে ছুটতে ভৈরবের সামনে এসে থেমে গেল। ভৈরবের মন্দিরে ট্রেন থামা মানেই কোন দুর্ঘটনা।··· দলে দলে লোক 'বড় পুল' অভিমুখে ছুটতে লাগল। তখন সহরের বুকে সন্ধ্যার ঘনছায়া নেমে এসেছে। পড়াশুনায় একটু ব্যস্ত ছিলাম। বাইরে বেরিয়ে এসে পথচারীদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম—এ পাড়ারই একটি মেয়ে ট্রেনে চাপা পড়েছে।

এ পাড়ারই মেয়ে! একটু কৌতূহল। একটা 'টর্চ' নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম অকুস্থলের উদ্দেশে। 'বড় পুল' আমাদের বাড়ি হ'তে বেশি দূর নয়। গিয়ে দেখলাম সেখানে ইতিমধ্যেই লোকে লোকারণ্য হ'য়ে গেছে। সে এক বীভৎস ব্যাপার। মেয়েটি বোধ হয় ইঞ্জিনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—তাই ইঞ্জিনের সামনে যে জালটা থাকে তার আঘাতে সে প্রায় দশ পনেরো হাত ওপর থেকে ছিটকে মাঝখানে এসে পড়েছে। এই পতনের ফলেই সম্ভবত তার মৃত্যু হয়েছে। ঘাড় ও পিঠের শিরদাঁড়াটা সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে—মাথাটা ফেটে

গেছে।

অনুসন্ধানে জানলাম—আত্মহত্যা।

এই আত্মহত্যার কারণস্বরূপ যা জেনেছিলাম তা হচ্ছে এই।—মেয়েটি নিকটবর্তী একটি পাড়ার মেয়ে। বিয়ে হয়েছিল নদীর অপর পারের গ্রামে। মেয়েটির দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। স্বামী ছিল পানাসক্ত ও নষ্টচরিত্র। সেই নরপশু স্ত্রীকে কঠিনভাবে মারধর করতেও কুণ্ঠিত হ'ত না। ঘটনার দিন পরিস্থিতি চরমে ওঠে—যার পরিণতি এই আত্মহত্যা।

এই হ'চ্ছে ঘটনা। কিন্তু এর যদি এইখানেই পরিসমাপ্তি হ'ত তাহ'লে এ প্রসঙ্গ অবতারণের প্রয়োজন হ'ত না। ব্যাপারটা মোড় নিলে অন্য দিকে।

এই আত্মহত্যার পর লোকমুখে প্রায়ই শোনা যেত, মেয়েটা নাকি প্রতিদিনই রাত্রিতে লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। রাত নটা দশটার পর তাকে দেখা যায়। বলতে কি, এই জন্য বেশি রাতে সে রাস্তায় বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত স্থানীয় লোক একাকী চলাচল করত না।

আগেই বলেছি, মেয়েটির স্বামী ছিল পানাসক্ত ও নষ্ট-চরিত্র। সে নদী পেরিয়ে এসে সহরে চাকরী করত ও সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে যেত। স্ত্রী আত্মহত্যা করবার পর লোকটা কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল। সর্বদা অনুভব করতে লাগল যেন কেউ তাকে অনুসরণ করছে। রাত্রে বিছানায় শুয়েও

তার মনে হ'ত কে যেন তার পাশে শুয়ে। আতঙ্কে সে চিৎকার করে উঠত, 'চোর! চোর!' বাড়ির লোক ব্যাপারটা অনুভব করতে পেরেছিল। তাই তারা তাকে নিষেধ করল, একা একা রাত্রে না বেরুতে।

এর প্রায় একমাস পরে একদিন। প্রতিদিনের মত সেদিনও সে সন্ধ্যার পর নদী পেরিয়ে বাড়ি ফিরছিল। অন্ধকার বেশ গভীর—চারদিকে জনমানব নেই—রাত্রে নদী পেরিয়ে বাড়ি ফেরা তার অনেক দিনের অভ্যাস—কিন্তু আজ মনে হল কে যেন তার পিছু পিছু আসছে। কে? পিছনে তাকাল লোকটা। না, কেউ তো নেই, তার ভ্রম। আবার যেই সে কয়েক পা চলেছে, আবার সেই পদশব্দ। লোকটা আর একটু হেঁটে নদীতে নামল, যেখানে তার আত্মঘাতী স্ত্রীকে পোড়ান হয়েছিল সেখান পর্যন্ত বেশ এল। কিন্তু তারপর আর যেন পা চলতে চায় না। সেই মহাশ্মশানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা—পদশব্দ এবার যেন আরও নিকটবর্তী···আরো··· আরো···। আবার না তাকিয়ে থাকতে পারল না সে। কিন্তু এবার যা দেখল তাতে তার মদের নেশা ছুটে গেল। সে দেখল তার মৃতা স্ত্রী উন্মুক্ত দুই বাহু বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করতে যেন ছুটে আসছে—ঝড়ে তার উন্মুক্ত কেশরাশি হাওয়ায় উড়ছে ···ভাঁটার মত চোখ দুটো যেন দেহ হ'তে বেরিয়ে আসতে চাইছে···দেহে কোন বস্ত্র নেই···সম্পূর্ণ উলঙ্গ। হতভাগ্য স্বামী এ দৃশ্য সহ্য করতে পারল না—ছুটল সে জীবনপণ করে।

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না।

ছুট···ছুট···ছুট। নদীর তীরবর্তী ঝোপ জঙ্গল ও তরকারীর ক্ষেত পেরিয়ে যখন সে বাড়িতে পৌঁছল, তখনও তার জ্ঞান আছে। কিন্তু বড় তৃষ্ণা। সে এক গ্লাস জল চাইলে।

তারপর তার জ্বর এল—দ্বিতীয় দিনে জ্ঞান হারাল, তৃতীয় দিনে মুখ দিয়ে ফেনা উঠতে লাগল এবং যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করতে করতে মরজগৎ ত্যাগ করল। কি রোগে সে মারা গেল, তা কেউই নির্ণয় করতে পারল না।

এমনি করে কি এক দেহাতীত স্ত্রী তার জীবন্ত স্বামীর ওপর প্রতিশোধ নিলে—যে তার সোনার সংসার কঠোর আঘাতে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছে—জীবনে তাকে সুখ দেয়নি···বাঁচতেও দেয়নি? যে অপরকে বাঁচতে দেয়নি—তার নিজেরও কি বাঁচবার অধিকার আছে?

জানি না এ প্রশ্ন সেই লোকান্তরিতার হৃদয়ে জেগেছিল কিনা?

কোম্পানীগঞ্জের কুঠি

মন্মথকুমার চৌধুরী

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৩০ সালের মে-জুন মাসে। চারদিকে তখন জোর আইন-অমান্য আন্দোলন চলেছে। ছেলে-মেয়েরা স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। পুঁথিপত্তর সব মাথায় উঠেছে। এমন সময় শিলং থেকে দিদির চিঠি এলো। দিদি লিখেছেন, 'পড়াশোনা তো শিকেয় উঠেছে। তা এই সময়টা স্টলে স্টলে চা খেয়ে আর স্বদেশীর জন্য হৈ চৈ করে শরীরটা মাটি না করে শিলং চলে এসো। শিলংএর আবহাওয়া এখন চমৎকার। এখানে এলে শরীরও ভালো থাকবে—পড়াশোনাও

হবে।'

চিঠি তো নয়—আমি যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেলাম। পাইনের ঘনবীথি আর আঁকাবাঁকা নদী বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শৈলস্বপ্ন রহস্যময় শিলং! বহুদিন পর এবার সুযোগ এলো।

তখনও পাহাড়ের বুক চিরে শিলং-সিলেট মোটরের রাস্তা খোলে নি। এখনকার মতো আরাম করে সকালে চা খেয়ে দুপুরে শিলং পৌঁছে মধ্যাহ্নভোজন করা চলতো না। শিলংএর পথ ছিল যেমনি দুর্গম, তেমনি সময়-সাপেক্ষ। ট্রেনে গৌহাটি ঘুরে যাওয়া যেত বটে, কিন্তু তা খুবই ক্লান্তিকর ছিল এবং তাতে সময়ও লাগত অনেক বেশি। সিলেটের লোকেরা সাধারণতঃ সাদিখাল দিয়ে নৌকাযোগে ভোলাগঞ্জ পৌঁছতো। সেখান থেকে পরদিন পাহাড় ভেঙে, চড়াই-উৎরাই করে মুখমাই পৌঁছতে হতো। সেখান থেকে ঢালা মোটরে একেবারে শিলং।

ভাগ্যক্রমে সেইদিনই শিলং-যাত্রী সঙ্গী জুটে গেল। আমাদেরই পরিচিত ডাক্তারবাবুর ভাগ্‌নে অতীনবাবু। কলকাতায় থাকেন। শিলং যাবার পথে সম্প্রতি মামার বাসায় সিলেটে এসেছেন।

সাদিখালের ভেতর দিয়ে আমাদের নৌকা তর্ তর্ করে বয়ে চলেছে—মনে হচ্ছে যেন একটা সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। সাদিখাল আসলে একটি নদী—

কিন্তু এত অপরিসর যে খালের মর্যাদা দিলেও বেশি দেওয়া হয়।

কোম্পানীগঞ্জ ভোলাগঞ্জের আগের ফাঁড়ি। অনেকে এখানে ডাক-বাংলায় রাত কাটিয়ে পরদিন শিলং রওয়ানা হন। আমি অতীনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় উঠবেন? ডাক বাংলায়?'

'না। দবির খাঁ বলে মামাবাবুর এক ব্যবসায়ী বন্ধুর একটি বাড়ি আছে কোম্পানীগঞ্জে। ভদ্রলোকের হরেক রকম জিনিসের ব্যবসা আছে—আলু, শুঁটকি আরও কত কি! তাঁকে প্রায়ই শিলং-সিলেট ছুটোছুটি করতে হয় বলে এখানে একটি ঘাঁটি করেছেন। মাঝে মাঝে এসে থাকেন। দেখাশোনার জন্য দুজন লোক আছে বাড়িতে। কোন অসুবিধে হবে না আমাদের।'—আমি যাতে আপত্তি না করি এজন্যে খুব জোর দিয়ে বললেন, 'কোথায় উঠবেন গিয়ে মশাই ভোলাগঞ্জে? শুনেছি—এত মশা যে একটা লোককে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাহলে আর দুচোখ এক করতে হচ্ছে না আজ রাত্তিরে।'

আমি হেসে বললাম, 'আর ভয় দেখাবেন না, আমি আপনার শরণাপন্ন হলাম।'

কোম্পানীগঞ্জের বাড়িতে এসে যখন পৌঁছলাম—তখন আকাশে তারা ফুটেছে। দবির খাঁ সাহেবের চিঠি সঙ্গে ছিল। সুতরাং কোনরকম বেগ পেতে হলো না। চৌকিদার রহমান এসে ঘর খুলে গেল। চারদিকে ঘন জঙ্গলাকীর্ণ অপরিচিত

এই বাড়িতে এসে মনটা যেন কেমন উস্‌খুস্‌ করতে লাগল। শেষে মনকে বোঝালাম—জীবনে এই প্রথমবার সিলেটের বাইরে পা বাড়িয়েছি, তাই অকারণে মনটা বার-বার চঞ্চল হয়ে উঠছে। আমরা ক্রমশ পাহাড়ের কাছে এগিয়ে চলেছি। তাই একটা বৃহতের স্পর্শাভাস বার বার আমাকে আচ্ছন্ন করতে চাইছে।

দানবের থাবাযুক্ত তলহীন স্রোতস্বিনী সাদিখাল দিয়ে আপনি যদি কোনদিন পড়ন্ত রোদে বিকেলে খাসিয়া পাহাড়ের পাদমূলের দিকে এগিয়ে যান—একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা, এক রহস্যময় অরণ্যাভাস, একটা না-জানি-কি-আছে ধরনের চেতনা আপনারও সমগ্র সত্তাকে এমনি করে অভিভূত করে ফেলবে। কিন্তু সে কথা যাক।

রহমান এসে সেলাম করে দাঁড়াল, 'বাবুজী, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে?'

অতীনবাবু এই তত্ত্ব-তালাসীতে বেশ খুশি হয়ে বললেন, 'খাবার আমাদের সঙ্গেই আছে রহমান। কিন্তু চায়ের জন্যে এক কেটলি গরম জল চাই যে!'

'আবদুলকে দিয়ে আমি এক্ষুণি পাঠিয়ে দিচ্ছি বাবুজী।' বলে রহমান গরম জলের ব্যবস্থা করতে গেল। আবদুল এখানকার বাবুর্চি।

অতিথিদের যাতে সেবাযত্নের কোন ত্রুটি না হয়—দবির খাঁ চিঠিতে বিশেষ করে লিখে দিয়েছিলেন।

একটু পরে রহমান এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। ভাবটা এই—বাবুদের আর কিছু হুকুম করবার আছে কি না।

অতীনবাবু বললেন, 'কি রহমান—কিছু বলবে?'

রহমান ইতস্তত করে বললে, 'বাবুজী, একটা কসুর মাপ করতে হবে।'

অতীনবাবুও লুফে নিয়ে বললেন, 'নেহি নেহি, কসুর কুছ হুয়া নেহি।' রহমানের ব্যবহারে যে কোন ত্রুটি হয় নি—তা বোঝাবার জন্য আনন্দের আতিশয্যে তিনি হিন্দীতে বলতে আরম্ভ করলেন। রহমান ঈষৎ হেসে বললে, 'বাবুজী আজ আমাকে ছুটি দিতে হবে। আবদুল রইল—আপনাদের যা দরকার ওকে ফরমাস করবেন।'

'বেশ তো, আমাদের আর কিছু চাই না। তুমি কোথায় যাবে?'

'বাড়িতে। আবার কাল সকালে ফিরে আসব। ফি বুধবারেই আমি পুঞ্জীতে যাই বাবুজী।' রহমানের বাড়ি পাঞ্জাবে। দবির খাঁ তাকে এখানে নিয়ে আসেন। কথায় কথায় জানা গেল একটি খাসিয়া মেয়েকে বিয়ে করে রহমান এই অঞ্চলেই বসতি স্থাপন করেছে।

রহমান তবু গেল না। কি যেন বলবার জন্যে দাঁড়িয়ে রইল।

'আর কিছু বলবার আছে রহমান?' অতীনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না

'বাবুজী—আপনারা দুজন আছেন, তবু কথাটা ইয়াদ করিয়ে দিয়ে যাই। কোম্পানীগঞ্জ জায়গাটা খুব ভাল নয়, বাবুজী।'

হো হো করে হেসে উঠলেন অতীনবাবু—'ভাল নয় মানে—চোর-ডাকাতের ভয়? তা আমার সঙ্গে তো খানকয়েক বই আর এই যা কাপড়-চোপড়। আর আমার বন্ধুটির সঙ্গেও তাই। আমাদের কাছে পাবে কি রহমান? এই যা আছে—তাতে চোর-ডাকাতের মজুরী পোষাবে না! সুতরাং আমরা নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে পারি! কি বলেন চৌধুরী?'

আমি কিন্তু প্রাণ খুলে হাসতে পারলাম না—ভদ্রতার খাতিরে শব্দহীন হাসির একটা বঙ্কিম রেখা ফুটিয়ে তুললাম মাত্র।

রহমান ততক্ষণে চলে গেছে।

চা-জলখাবার শেষ করে আমরা দুখানা চেয়ার নিয়ে সামনের বারান্দায় এসে বসলাম। নির্জন পরিবেশ—মনে হয় চারদিকে জড়িয়ে আছে কিসের এক অদ্ভুত প্রতীক্ষা! অতীনবাবু প্রথমে আরম্ভ করলেন, 'চৌধুরী, পড়া শেষ করে কোন্ লাইনে যাবার ইচ্ছে?'

একটা সুস্পষ্ট ক্লান্তির ছায়া নেমেছিল দেহমনে—খুব বেশি কথা কইবার ইচ্ছে হল না। বললাম, 'ডাক্তারি লাইনে যাবার ঝোঁকই আমার বেশি। কারণ আমার বাবা ছিলেন একজন ডাক্তার।' এইটুকু বলেই চুপ করে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এর সঙ্গে ব্যক্তিগত মন্তব্য না জুড়ে দিয়ে পারলাম না। বললাম,

'তবে ডিব্রুগড়ের মেডিক্যাল স্কুলে পড়ে ছোট ডাক্তার হতে আমি চাই না। ডাক্তারি যদি পড়তেই হয়—তবে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে। কিন্তু শুনেছি—তাতে দেদার খরচ, এমন সঙ্গতি তো আমাদের নেই।'

মুহূর্তে অতীনবাবুর মুখের রঙ বদলে গেল। চোখে-মুখে ফুটে উঠল ঈষৎ উত্তেজনার আভাস। গা এলিয়ে আরাম করে বসেছিলেন। হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন চেয়ারে। গম্ভীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'বড় ডাক্তার হলেই মানুষের সব রোগ সারান যায় বলে আপনার ধারণা?'

আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল। আমি বললাম, 'তা তো নয়ই।' তর্ক করবার মত মনের অবস্থা তখন আমার নয়। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে।

'নয় মানে?' এক পর্দা সুর চড়িয়ে বলতে শুরু করলেন, 'মানুষ যত কেরামতিই করুক—খোদার ওপর খোদকারি করতে গেলেই সে হারবে। বিজ্ঞান মানুষের হাতে যত মন্ত্র আর যন্ত্র দিক না কেন—ঈশ্বরের চাইতে সে কোনদিন বেশি শক্তির অধিকারী হতে পারবে না—কোন দিন না।' একটু থেমে আবার তিনি বলতে লাগলেন, 'এই ধরুন, আমি মেডিক্যাল কলেজে পড়তাম—বরাবর ফার্স্ট হয়ে এসেছি। কিন্তু পাস করে ডাক্তার হবার ধৈর্য আর প্রবৃত্তি হলো না। একটা নতুন আলো দেখতে পেলাম—এক নতুন দৃষ্টি। এ-দুনিয়ায় তিনি ছাড়া আর গতি নেই।—মানুষ তাঁরই হাতের পুতুল

মাত্র।'

পাদ্রী সাহেবের মতো বক্তৃতা শোনবার জন্যই কি এই বচনবাগিশ লোকটি আমাকে কোম্পানীগঞ্জে টেনে এনেছিলেন? আমার তখন পরমতত্ত্ব আলোচনার মতো মনের অবস্থা নয়। এই বারান্দায়ই যদি কেউ একখানা কম্বলও বিছিয়ে দিত!

অতীনবাবু তবু ছাড়বেন না। জিজ্ঞেস করলেন, 'মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে আপনি বিশ্বাস করেন?'

'সবাই তো বলে আত্মার বিনাশ নেই।' সংক্ষেপে জবাব দিলাম।

'ঠিক—ঠিক।' উৎসাহে উদ্দীপ্ত হলেন অতীনবাবু, 'কখনো আত্মা এনেছেন?'

'হ্যাঁ—একবার।'

'কিসে? প্ল্যানচেট, না মিডিয়ামে?'

অতীনবাবুর ছু চোখে দীপ্তি স্ফুরিত হলো। বললাম, 'ঠিক আমি আনিনি। আমার দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় প্ল্যানচেট নিয়ে বসেছিলেন। আমি তাঁর সহযোগী ছিলাম মাত্র।'

'কাকে ডেকেছিলেন?'

'অনেককেই ডাকা হয়েছিল—তার মধ্যে একজন এসে-ছিলেন?'

'কে? কে?'

'শ্রীদুর্গা!'

ভীষণ দমে গেলেন অতীনবাবু। হতাশায় যেন চেয়ার

ভেঙে পড়লেন! তারপর উপদেশের ভঙ্গীতে বললেন, 'আত্মা আনা কি এতই সোজা! তার জন্যে চাই শুদ্ধ মন, শুদ্ধ দেহ!'

অবসাদে আমি তখন শয্যা-কাতর। ঈশ্বর, আত্মা, পরমতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবার মত মানসিক অবস্থা আমার নয়। ঘন ঘন হাই তুলতে লাগলাম। এই অবস্থা দেখে অতীনবাবুর সম্ভবত দয়া হলো। বললেন, 'যান—খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুনগে। বড্ড ঘুম পেয়েছে আপনার। শিলং-এর জন্য আলোচনা এখন মুলতুবী রইল।'

আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। মা টিফিন কেরিয়ারে খাবার দিয়েছিলেন—যাতে রাস্তায় খাবার কিনে খেতে না হয়। অতীনবাবুর সঙ্গেও খাবার ছিল। দু'জনে মিলে তার সদ্ব্যবহার করা গেল। খাওয়া দাওয়ার পর আমি প্রস্তাব করলাম, 'ঐ তো বারান্দার কোণের ঘরটা খালি পড়ে আছে। আবদুল ওখানেই আমার শোবার ব্যবস্থা করে দিক।'

আমার ভয় হলো – এক ঘরে শোবার ব্যবস্থা হলে অতীন-বাবুর উপদেশের জ্বালায় দু'চোখের পাতা এক হবার আর আশা নেই। হেসে বললেন অতীনবাবু, 'আপনাকে আলাদা ছেড়ে দিতাম না, কিন্তু রাত্তিরে শোবার আগে আমি নিয়মিত আসনে বসি। আপনার তাতে ঘুমের ব্যাঘাত হবে—এমনি বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই যান—ওঘরেই আরামে শোবেন।'

আবদুল ঘর খুলে দিল। পেছনের সারিবদ্ধ ঘরগুলিতে

চালানোর জন্য শুঁটকি আর আলু মজুত রয়েছে বলে আবদুলের কাছে শুনলাম। তাই বোধ হয় এই ঘরগুলো শোবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না। যাক, মাত্র একটা রাত তো !

সারাদিন নৌকা-ভ্রমণে এমনি অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম যে, বিছানার স্পর্শ পেতেই গাঢ় ঘুমে ডুবে গেলাম।

...হঠাৎ মাঝরাতে বাতাসের একটা প্রচণ্ড শোঁ শোঁ শব্দ শুনে হকচকিয়ে লাফিয়ে উঠলাম। কাচের জানালার ছিট্-কিনিগুলো ভালো করে লাগানো হয়নি। ভাগ্যিস জেগে উঠেছি। রহমানের কথাটা মনে পড়লো, 'জায়গাটা ভালো নয় বাবুজী।' অতীনবাবু সংসার-নিস্পৃহ লোক—চোর ডাকাতের হাতে জিনিসপত্তর খোয়া গেলেও আফশোষ করবেন না। কিন্তু গরম কাপড় ভর্তি আমার স্যুটকেসটা গেলে যে আমি সহজে তা জোটাতে পারব না। কিন্তু কোথায় বাতাস, বাতাসের নামগন্ধও নেই। মেঘের আড়ালে ঢাকা চাঁদের মরা আলো এসে অদূরে ঘন অরণ্যের চেহারাকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে। দরজা না হয় ভুলে বন্ধ করিনি—কিন্তু শব্দই বা শুনতে পেলাম কিসের আর জানালাই বা খুলল কিসের জোরে ? পাহাড়ী জায়গা—হয়তো বা দমকা হাওয়া এসে-ছিল। যাক্ গে—কষে জানালা-দরজা বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়লাম। এবার মণিপুরী সুজনিখানা দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে নিশ্চিন্ত আরামে বাকি রাতটা ঘুমের কোলেই নিজেকে ছেড়ে দিলাম। গভীর ক্লান্তির পর গাঢ় ঘুমের কি অসীম

আনন্দ।

কিন্তু আরাম করা হলো না। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম মনে নেই। হঠাৎ সেই বুক-কাঁপানো শোঁ শোঁ শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো। কি অদ্ভুত কাণ্ড! ঝন্ ঝন্ করে আমার চোখের সামনে দরজা জানালা সব একটা একটা করে খুলে যেতে লাগল। অথচ বাইরে ঝিরঝিরে হাওয়া পর্যন্ত নেই। তবে আপনা থেকে দরজা-জানালাগুলো খুলে যাচ্ছে কিসের জোরে? নিশ্চয়ই ভৌতিক কাজ! আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। আমি দাঁড়াবার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেললাম। কে যেন জোর করে বিছানার দিকে আমায় ঠেলে রেখেছে। আমি চেঁচিয়ে ডাকবার চেষ্টা করলাম—'অতীনবাবু, অতীনবাবু।' কিন্তু আমার গলা দিয়ে ক্ষীণ আওয়াজটুকুও বেরুলো না। আমি তখনও জ্ঞান হারাই নি—কিন্তু আমি অশক্ত, নির্বাক। কি অসহনীয় অবস্থা! তারপর—তারপর যা দেখলাম—দীর্ঘ বাইশ বছর পরে তা লিখতে গিয়েও আমার সারা শরীর সেই দৃশ্য স্মরণ করে শিউরে উঠছে। মনে হলো—সর্বাঙ্গ শুভ্র বসনে আচ্ছাদিত একটি তরুণী বধূর ছায়া-মূর্তি নেমে এল কড়িকাঠের ওপর থেকে এবং শূন্যে পা ফেলে দ্রুত তিনি জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন সামনের জঙ্গলের দিকে। আমি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম! তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।

পরদিন সকালে যখন চোখ মেললাম তখন পাশে বসে আছেন অতীনবাবু। সামনে রহমান।

অতীনবাবু বললেন, 'নাও ভায়া—গরম চা খাও। ভয় নেই। বড্ড নার্ভাস তুমি—তাই ভয় পেয়েছিলে। আমারই ভুল হয়েছিল—একে নতুন জায়গা—তায় বাইরে বেরিয়েছ এই প্রথম। একলা থাকতে দেওয়াটা ঠিক হয় নি।'

গত রাত্রির সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললাম। একটা দুঃস্বপ্নের ঝড় বয়ে গেছে আমার ওপর দিয়ে। রহমান অপ-রাধীর মত বললে, 'আমি থাকলে এই তকলিফ আপনার হতো না বাবু। আবদুল নতুন লোক—তাই ও ঘরে আপনাকে থাকতে দিয়েছিল।' তারপর রহমান গত রাত্রের অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে যে কাহিনী বর্ণনা করল তা সংক্ষেপে এই—গত সিপাহী বিদ্রোহের পর ইন্দ্রজিৎ সিং নামে একজন বিদ্রোহী সিপাহী আত্মগোপন করবার জন্য এই অঞ্চলে চলে আসেন। কালক্রমে তিনি এক বিরাট দল গড়ে তোলেন। তখনকার দিনে ইন্দ্র-সর্দারের নামে ভয়ে লোক কাঁপত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের বহু আগে থেকে চীন থেকে সমতল অঞ্চলে আফিংএর চোরাই চালানের পথে কোম্পানীগঞ্জ ছিল একটি প্রধান ঘাঁটি। 'ইন্দ্র-সর্দার' তেমনি একটি বড়দলের পাণ্ডা ছিলেন। তা ছাড়া লোকের ধারণা ছিল—তিনি ছিলেন পিশাচ-সিদ্ধ। 'সাদিখালে' যে সব চোরা ঘূর্ণি আছে, সিলেটের ভাষায় যাকে বলে 'ডর্'—সেগুলির অধিপতি অপদেবতা দানবরা নাকি ছিল ইন্দ্র-সর্দারের বশীভূত। যে সব যাত্রী লুণ্ঠনের ভয়ে পূর্বাহ্ণে সতর্কতা অবলম্বন করতো, ইন্দ্র-সর্দারের

বেড়াজাল তারাও এড়াতে পারত না। ঐ ঘূর্ণি বা 'ডরে' তাদের নৌকা ডুবে যেত। তখনকার এই পথ ছিল যেমন দুর্গম তেমনি বিপদসঙ্কুল। তখনকার দিনে শাসনব্যবস্থা ছিল খুবই দুর্বল। ডাকাতি, রাহাজানি ছিল নিত্যকার ঘটনা। ইন্দ্র-সর্দারকে ভেট্ না দিয়ে কোম্পানীগঞ্জের ফাঁড়ি কেউ পেরিয়ে যেতে পারত না। আর এই 'কুঠি' ছিল ইন্দ্র-সর্দারের সদর ঘাঁটি। এখন তো এখানে লোক-বসতি হয়েছে। তখন এর চারদিকে ছিল গভীর শ্বাপদসংকুল অরণ্য। জনশ্রুতি এই যে, বিবাহের পর এই নদীপথে বর-কনে ফিরছিলেন। ইন্দ্র-সর্দারের দল হানা দিয়ে সদ্য-বিবাহিতা ব্রাহ্মণ বধূকে হরণ করে নিয়ে আসে এবং তার জন্যে মোটা টাকার মুক্তিপণ দাবী করে। কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণ তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বারান্দার কোণে উত্তরমুখী এই কক্ষেই বন্দিনী ছিলেন সেই তরুণী-বধূ। নির্দিষ্ট দিন এল—কিন্তু মুক্তি-পণের টাকা এসে পৌঁছল না। তখন নিজের সম্ভ্রমরক্ষার জন্য কড়িকাঠে শাড়ীর আঁচল ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে মুক্তিপণের টাকাটা ফাঁকি দিয়ে চলে যান তরুণী-বধূ। সেই থেকে প্রতি রাত্রেই এই কক্ষের দরজা-জানলা আপনা থেকেই খুলে যায়। আর কড়িকাঠের ওপর থেকে সেই শুভ্রবসনা ছায়া-মূর্তিও তর্ তর্ ক'রে শূন্যে হেঁটে বাইরের ঘন অরণ্যে মিলিয়ে যায়। তারপর এই কুঠি একজন সাহেব কিনে নেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি মণিপুর যুদ্ধে মারা যান। তারপর বহু হাত ঘুরে বর্তমানে 'কোম্পানীগঞ্জের

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না।

কুঠি' দবির খাঁর মালের আড়তে পরিণত হয়েছে।

কে জানে নববধূর বন্দী আত্মা হয়তো যুগ যুগ ধরে বাঞ্ছিত প্রিয়সঙ্গমের জন্য মুক্তির পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে? হয়তো এ কাহিনী অতিরঞ্জিত, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে জনশ্রুতি-পুষ্ট এ কাহিনী হয়তো বহু কাল্পনিক শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে উঠেছে—কিন্তু আপনি যদি কখনো কোম্পানীগঞ্জের পথে শিলং যান এবং য়্যাডভেঞ্চার-প্রিয় হন (নইলে কি আর আপনি সিলেট-শিলং মোটরের আরামপ্রদ রাস্তা ছেড়ে এই দুর্গম এবং ক্লেশকর পথে পা বাড়াবেন?) এবং আপনাকে যদি ঘটনাক্রমে কোনদিন 'কোম্পানীগঞ্জের কুঠি'র বারান্দার উত্তরমুখী ঘরে রাত্রি-বাস করতে হয়—তবে মাঝরাতে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে আপনারও ঘুম ভেঙে যাবে। নিদ্রালু চোখে চমকে উঠবেন আপনি; দেখবেন—কাচের দরজাগুলো সব সশব্দে খুলে যাচ্ছে। কিন্তু ভুলেও কোথাও বাতাসের ছোঁয়া নেই। তখন তাড়াতাড়ি ঘুমের আবেশে জানালা বন্ধ করেন নি, এমন কি ঘরের দরজাটায় পর্যন্ত খিল দিতে ভুলে গেছেন বলে আপনার নিজের ওপরই নিজের রাগ হবে। দরজা খোলা, সঙ্গে আপনার এত মালপত্তর—বিদেশ-বিভুঁই···অচেনা জায়গা···ভাগ্যিস ঘুম ভাঙলো! এবার খুব কষে সব বন্ধ করে পরম নিশ্চিন্তে চাদর-মুড়ি দিয়ে তো আরাম করে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন! কিন্তু বেশিক্ষণ আরাম-শয়ন আপনার কপালে নেই। প্রচণ্ড শব্দে আপনাকে লাফিয়ে উঠতে হবে। চোখের সামনে দরজা-

জানলাগুলো ঝন্ ঝন্ শব্দে খুলে যাচ্ছে। বাইরে না ঝড়-বৃষ্টি, না দমকা হাওয়া! নিশুতি রাতে এমন আশ্চর্য পরিস্থিতিতে আপনি ভয়ে শিউরে উঠবেন না, একবারও বুক দুরু দুরু করবে না, এমন কথা আপনি হলফ্ করে বলতে পারেন না…যতই বলিষ্ঠ দেহ আর সবল মনের অধিকারী আপনি হোন না কেন। কড়িকাঠ থেকে নেমে-আসা শুভ্রবসনার ত্বরিৎ পদক্ষেপে বহির্গমনের অলৌকিক দৃশ্য আপনি হয়তো নাও দেখতে পারেন…হয়তো ওটা আমার ইল্যুসন্…চোখের ভ্রম; কিন্তু শক্ত করে কষে-আঁটা দরজা-জানলাগুলো কোন্ অদৃশ্য শক্তির বলে আপনা-আপনি খুলে যাচ্ছে…একটা গা-ছম্‌ছম্ করা আতঙ্কে আপনি হতবাক হয়ে রইবেন…সাধারণ বুদ্ধিতে এই রহস্যের কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাবেন না।

অজানা নির্দেশ

শ্রীলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা কোন দিনও চলে না, এমন সব ঘটনা নিয়েও আমরা মাথা ঘামাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। কিন্তু কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পেরে সে ঘটনাকে আমরা বলে থাকি একটা 'অ্যাকসিডেণ্ট'। আমার জীবনে ঘটেছিল এই রকমই একটি ছোট্ট ঘটনা, যেটা বুদ্ধি দিয়ে আমি এ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করতে পারি নি। সে আজ থেকে প্রায় ১৫।১৬ বছর আগের ঘটনা। খুলনা সহরে তখন আমার বাবা ওকালতি করতেন। মা, বাবা, আমরা চার বোন ও এক ভাই নিয়ে

আমাদের ছোট্ট সংসার। ছবির মতন পরিপাটি খুলনা সহরের ভিতরে ছবির মতনই আমাদের বাড়িটি ছিল। আমাদের বাড়িটির নিচে ছিল চারখানা ঘর, দুটো বারান্দা, বেশ বড় উঠোনের এক পাশে রান্নাঘর এবং দোতলায় দু'খানা ঘর, বারান্দা আর ঘরের দুদিকে দুটো ছাদ। ছাদে ছিল আমাদের Roof Garden, কত রকমের ফুলের গাছ যে টবে টবে সাজান ছিল তার হিসেব দেওয়া যায় না। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় যেতে গেলে সিঁড়ি যেখানে বাঁক ঘুরে আবার উপরে উঠে গেছে সেইখানে ছিল একটা ছোট্ট জানলা, সেই জানলা দিয়ে দেখা যেত খানিকটা জমি ছেড়ে প্রকাণ্ড একটা পুকুর, তার চার-পাশে গোলপাতার ছাউনি দিয়ে সারি সারি মেটে ঘর। সেখানে থাকতেন ফরেস্ট অফিসের লোকেরা সপরিবারে। সেটা আমাদের বাড়ির পেছন দিক, সদর দিয়ে ঘুরে না গেলে সেখানে যাওয়া যায় না। তার একটু পরেই খুলনার পুলিস ব্যারাক। এই ফরেস্ট অফিসের বাবুদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের প্রায় সকলের সঙ্গে আমাদের আলাপ ছিল। আমার মা তাদের নিজের লোকের মতনই ভাবতেন। তাদের দুঃখে, সুখে তাই আমার মা তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতেন তাদেরই একজন হয়ে।

সেদিন শান্ত নিস্তব্ধ দুপুর। বাবা যথারীতি 'কোর্টে' গেছেন। মা সারাদিনের কাজ সেরে হাতে একখানা মাসিক পত্রিকা নিয়ে উপরে শুয়েছেন। অন্য ভাই-বোনেরা সবাই

গেছে স্কুলে। কিন্তু কি একটা সামান্য কারণে আমি সেদিন স্কুলে যাই নি। বইটা পড়তে পড়তে মার একটু ঘুম এসেছে। আমি মার পাশে বসে স্কুলে না যাবার ক্ষতিটা পূরণ করে চলেছি, একান্ত মনোযোগের সঙ্গে। মন আমার বই-এর পাতায় নিবিষ্ট, কারণ স্কুলেব সঙ্গীরা একদিনের পড়াও যাতে এগিয়ে না যায় এই আমার ইচ্ছে। হঠাৎ কি মনে হল, এত বড় গভীর অখণ্ড মনোযোগ গেল চমকে ভেঙে। তৎক্ষণাৎ বইটা ফেলে রেখে উঠে দাঁড়ালুম, দ্রুত-লঘু পায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বাড়ির এত জায়গা থাকতে সিঁড়ির বাঁকের সেই জানলাটার পাশে বসে পড়লুম। সামনেই খানিকটা জমি ছেড়ে তরতর করে বয়ে চলেছে সেই প্রকাণ্ড পুকুর বুকে পদ্মফুলের অপূর্ব শোভা নিয়ে। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। শুধু পুলিস ব্যারাকের পুলিসরা তাদের বিশ্রাম উপভোগ করছে ঝম্‌ঝম্ শব্দে করতাল বাজিয়ে হৈ হৈ সঙ্গীতের দ্বারা। তারই শব্দ ভেসে এসে দুপুরের নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধতাকে কেটে দিচ্ছিল বেতালা তালে। কেউ কোথাও নেই। শুধু সেই মেটেঘরের পাঁচ বছরের ছোট্ট ছেলে অতুল হাতে একখানা ছিপের মতন লাঠি নিয়ে পুকুরের পদ্মফুল তোলায় ব্যস্ত। কিন্তু কি আশ্চর্য, যেই আমি সেই জানলায় বসেছি, প্রায় সেই মুহূর্তেই দেখলুম অতুল পা পিছলে ডিগবাজি খেয়ে পুকুরের ভেতরে সেই পদ্মবনে পড়ে ডুবে গেল। মুখ দিয়ে তার একটা শব্দও বার হল না। হতবুদ্ধি হয়ে গেলেও আমি তীব্র চিৎকার করে উঠলুম। আমার চিৎকারে

মা ছুটে এলেন, মুখে উদ্বেগ আর আশঙ্কা নিয়ে। মাকে সংক্ষেপে ঘটনাটি বলে দেখিয়ে দিলুম জলের ভেতরে ছোট্ট দুখানি হাত। তখন মা আর আমি সেখান থেকে চেঁচিয়ে ছেলেটির মায়ের নাম ধরে ডাকতে লাগলুম। কারণ আগেই পুকুরের কাছে যেতে গেলে সদর দিয়ে ঘুরে না গেলে যাওয়া যায় না। আমার ও মায়ের পরিত্রাহি চিৎকারে অতুলের মার ঘুম ভাঙল বোধ হয়। দৌড়ে এসে উদ্‌ভ্রান্তের মতন ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে। তারপর চুলের মুঠি ধরে অচৈতন্য অতুলকে জল থেকে টেনে তুললেন। ততক্ষণে পুকুরের পাড়ে আরও লোক জমে গেছে। আমি ছুটে এবার সেখানে গেলুম। অতুলকে তখন মাটির দাওয়ার উপর শোয়ান হয়েছে। অতুলের মা ব্যাকুলভাবে ছুটোছুটি করছেন। খানিকক্ষণ প্রক্রিয়া করবার পরে অতুল চোখ মেলে চাইল। সবাই বললে, 'বেঁচে গেল,' 'খুব সময় জল থেকে তোলা হয়েছে', 'বেশি জল খায় নি'। অতুলের মা তখন জলভরা চোখে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, অতুলকে নয়, আমাকে। আজ আমি নাকি তাঁর অমূল্য সম্পদকে খোয়া যেতে দিই নি। তিনি আমায় কি বলে আশীর্বাদ করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। জড়িয়ে ধরে, আদর করে তিনি আমায় অস্থির করে তুললেন। আমি নাকি আজ তাঁর ছেলেকে বাঁচিয়েছি। কিন্তু আমিই কি তাঁর ছেলেকে বাঁচিয়েছি? আমি তো অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে পড়ায় মগ্ন ছিলুম। কে আমাকে হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়ে দিয়ে পুকুরের

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না

উপর দৃষ্টি ফেলিয়েছিলেন ?

কিন্তু কেন ? কেন আমার হঠাৎ ইচ্ছে হল নিচে যাবার ? নিচে যাবার ইচ্ছে হল তো নিচে না গিয়ে বাড়ির এত জায়গা থাকতে মাঝপথে সিঁড়ির জানলায় বসলুম কেন ? আর কেনই বা আমি বসবার এক মুহূর্ত পরেই অতুল পুকুরে পড়ে গেল কিছুক্ষণ আগে না পড়ে ?

আজও নিস্তব্ধ দুপুরে করতালের ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ শুনলে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই দিনের ঘটনা। আর প্রশ্ন জাগে কার নিঃশব্দ নির্দেশে চালিত হয়ে সেদিন আমি উঠে জানলায় বসেছিলুম। আজও এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে এর বিচার করতে পারি না।

অপূর্ব স্বপ্নদর্শন

সত্যভূষণ সেন

বুদ্ধি দ্বারা অনেক বিষয়েরই ব্যাখ্যা চলে না ; সাধারণ বুদ্ধিতে যেমন জাগ্রত জীবনের অনেক বাস্তব ঘটনার ব্যাখ্যা চলে না, তেমনই অনেক স্বপ্নেরও ব্যাখ্যা চলে না। স্বপ্ন সম্বন্ধে কথা হতে পারে যে স্বপ্ন তো সবই আজগুবি ব্যাপার, তার আবার ব্যাখ্যা কি করে হবে ? কিন্তু বর্তমান যুগে সে কথা আর বলা চলে না। বর্তমান কাল পর্যন্ত স্বপ্ন সম্বন্ধে অনেক গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনাও হয়েছে ; তার ফলে স্বপ্নের উৎপত্তি, পরিণতি এবং তত্ত্ব সম্বন্ধেও অনেক

প্রকার ব্যাখ্যা, অন্ততঃ ব্যাখ্যার ধারা-নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আমার জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি এমন কয়েকটি স্বপ্নের সাক্ষাৎ পেয়েছি যা সত্যই অভূতপূর্ব ; ব্যাখ্যা আলোচনার পূর্বে আমি স্বপ্ন কয়টি যথাযথ বিবৃত করছি।

প্রথম স্বপ্ন

আমার প্রথম স্বপ্নেব ভৌগোলিক সংস্থান বিশেষ লক্ষণীয়, সেজন্য পটভূমিকা স্বরূপ আমার জীবনের ভৌগোলিক অভিজ্ঞতার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় শুধু প্রাসঙ্গিক নয়, প্রয়োজনও বটে। আমার জন্ম ঢাকা জেলার একটি গণ্ডগ্রামে, সে গ্রামে কত মাস বা কত বৎসব ছিলাম তা আমি বলতে পারব না, কারণ সে কালটা আমার পক্ষে স্মবণাতীত। আমার স্মৃতি-কালের মধ্যে এসে প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি আমি বাস করছি মৈমনসিংহ সহরে। হয়ত দু'তিন বৎসরের মধ্যেই সেখান থেকে গেলাম ফরিদপুর জেলার একটি গ্রামে, ধরা যাক গ্রামের নাম দাশর্তা। এই গ্রাম সম্পর্কে আমার স্মৃতিতে আছে, বাড়ির প্রায় অব্যবহিত পরেই একটি খাল, খালটি ছোট হলেও নৌবাহ্য ছিল এবং খালে জোয়ার-ভাঁটা চলত বলে মনে পড়ছে। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পের সময় আমরা এই গ্রামে ছিলাম, তখন আমার বয়স ছয় বৎসর ; তার কিছু পরেই আমরা এ গ্রাম ছেড়ে চলে আসি, আমার জীবনে আর কখনও এই দাশর্তা

গ্রামে যাবার উপলক্ষ ঘটেনি। তারপরে আমার স্কুল-কলেজের জীবন কাটে ঢাকা সহরে। আমার চাকুরী জীবনের কর্মক্ষেত্র ছিল কলকাতা, ঢাকা; উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সহর, বেলুচিস্থানের রাজধানী কোয়েটা এবং অধিকাংশ সময় আসামরাজ্য। ভ্রমণ পর্যটন উপলক্ষে আমি বাঙলাদেশের অধিকাংশ জেলা সহর, কক্সবাজার এবং সুন্দরবনের সমুদ্রতীর এবং দার্জিলিং-এর পার্বত্য নগর থেকে হিমালয়ের দৃশ্যও দেখেছি। তা ছাড়া রাঁচী, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা এবং দিল্লীও ঘুরে এসেছি, আসামের সকল জেলা ও মহকুমা সহর এবং শিলং, ইম্ফল, কোহিমা প্রভৃতি পার্বত্য সহরও দেখেছি।

আনুমানিক দশ-বার বৎসর পূর্বে একদিন রাত্রিতে স্বপ্ন দেখলাম। জীবনের অভিজ্ঞতায় কত নদনদী, পর্বত প্রান্তর, সাগরের বিস্তার, কত সুদৃশ্য নগরী, মানুষের সৃষ্টি তাজমহলের ন্যায় সৌন্দর্য-প্রতিমা এবং হিমালয়ের গরিমাময় দৃশ্যও দেখলাম। কিন্তু স্বপ্নে এসে দেখা দিল সেই নগণ্য দাশর্তা গ্রামের সেই অপরিসর খাল। স্বপ্নে দেখলাম সেই খালের উপরে একখানা খোলা নৌকা এবং নৌকার উপরে দাঁড়িয়ে আমরা দুজন মাত্র আরোহী, আমি এবং আমার ভ্রাতৃকল্প এক অতি নিকট-আত্মীয়, মনে করা যাক তার নাম খগেন। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ঘটনা, যদি স্বপ্নরাজ্যের ঘটনাকে ঘটনা বলা যায়, আমি এবং খগেন আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ মৃতদেহ কাঁধে বহন করে দাঁড়িয়ে, যতদূর মনে পড়ে প্রত্যেকের বাঁ কাঁধে মৃতদেহ, কাঁধের দু'দিকে

অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের শরীরের সম্মুখভাগে এবং পেছনে মৃতদেহ বেশ সুবিন্যস্তভাবে ঝুলছে, মানুষের শরীর সাধারণভাবে এত নমনীয় হয় না যে, (বিশেষতঃ মৃত্যুর পরে) তা কারও শরীরের সম্মুখভাগে এবং পেছনে এমন সুবিন্যস্তভাবে লেপটে থাকতে পারে।

নৌকা ঘাটে বাঁধা ছিল না, তখন নৌকাখানা খালের দুই তীরের সহিত সমান্তরালভাবে ছিল। নৌকার গতিমুখ দেখে কিছু বোঝবার উপায় না থাকলেও আমরা জানতাম, জ্ঞানেই হোক বা অনুভূতিতে হোক যে, নৌকার গন্তব্যস্থল খালের অপরতীর, যে তীরে দাশর্তা গ্রামে আমাদের বাড়ি ছিল তার অপর তীরে। নৌকার মাঝি হয়ত একজন কি দুইজন ছিল কিন্তু স্পষ্ট মনে পড়ছে না। খগেনের সঙ্গে আমার কোন বাক্যালাপ হয়ত হয়নি, কিন্তু আমি অনুভূতিতে বুঝতে পারছিলাম যে, তার ও আমার চিন্তা ও অনুভূতি তখন একই ধারায় বয়ে চলছিল। আমরা জীবিত আছি অথচ নিজ নিজ মৃতদেহ বহন করে নিয়ে চলেছি এটা কি করে সম্ভব হল, এরকম সমস্যা, চিন্তা অথবা আমাদের মৃত্যু ঘটেছে সেজন্য কোন শোক দুঃখ বা বিভ্রান্তি, এসব কিছুই যেন আমাদের মনে স্থান পায়নি। আমাদের একমাত্র চিন্তা ছিল যে, এখন আমাদের একমাত্র দায়িত্ব খালের ওপারে গিয়ে নিজ নিজ মৃতদেহের যথাবিধি সংকারসাধন করা। তারপরেই ঘুম ভেঙ্গে গেল, স্বপ্নেরও সমাধি হল। স্বপ্নে যে দৃশ্যটি দেখতে পেয়েছিলাম এবং স্বপ্নের

মধ্যেই যে চিন্তাধারা বা অনুভূতি আমার মধ্যে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এস্থলে যথাযথভাবে তারই বিবৃতি দিলাম। স্বপ্নের এতদিন পরে দিনের বেলায় জাগ্রত অবস্থায় এই কাহিনীটি গুছিয়ে লিখলাম মাত্র। এস্থলে আমার জাগ্রত অবস্থার কৃতিত্ব ঐ পর্যন্তই তার বেশী কিছুমাত্র নয়।

দ্বিতীয় স্বপ্ন

প্রথম স্বপ্নটির দু'চার দিনের মধ্যে বা দু'এক মাসের মধ্যেই এই দ্বিতীয় স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি দিনের বেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি সম্ভবতঃ উত্তর কলিকাতার কোন অঞ্চলের পথে, অনেক রাস্তা, গলি, দু'ধারে ঘন বসতি, সবই যেন পুরানো বাড়ি, অনেক বাড়ির দেওয়ালের আস্তরণ ঝরে পড়ছে অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমি চলেছি একাকী। আমার মনে একমাত্র কল্পনা আমার নিজের শ্রাদ্ধক্রিয়ার অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করতে হবে। অনেকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিজের মৃত্যুর পূর্বেই নিজের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন করে যান, এরূপ বিধিও আছে শুনতে পাওয়া যায়। আমার ওরূপ কোন পরিকল্পনার কথা মনে হয়নি। আমার যে মৃত্যু হয়েছে সেজন্য আমার শ্রাদ্ধকার্যানুষ্ঠান খুব জরুরী হয়ে পড়েছিল এমন অনুভূতিও খুব স্পষ্ট ছিল না। আমার পর্যটনে আমার কেউ সঙ্গী ছিল এমন মনে পড়ছে না ; পথে লোকজনের ভিড়

তো ছিলই না, হয়ত লোকজন মোটেই ছিল না। স্বপ্নটি খুব সংক্ষিপ্ত ছিল। এই স্বপ্নের উপরে আমি নিজেও বেশী মূল্য আরোপ করিনি। এখন মনে হয় পূর্ববর্তী স্বপ্নের অব্যবহিত পরেই এটি এসে দেখা দিয়েছিল, সেই হিসাবে এই স্বপ্নটিকে পূর্ববর্তী স্বপ্নের উপসংহার বলা যেতে পারে কি? অন্ততঃ কোন প্রকার সংযোগ কল্পনা করা চলে হয়ত।

তৃতীয় স্বপ্ন

এই স্বপ্নটি ১৯৪৩ সালের ঘটনা; তখন আমি হিলি রেল স্টেশনের অনতিদূরে আমার বোনের বাড়িতে বসে ছুটি উপভোগ করছিলাম। বাড়িতে দুটি মাত্র কামরা। একটিতে থাকি আমি, অপর কামরাতে থাকে আর সকলে। ঘটনাক্রমে এই সময়ে আমার হাতে এসে পড়ল একখানা অতি প্রসিদ্ধ পুস্তক, Robert Louis Stevenson এর Strange Case of Dr. Jekyl & Mr. Hyde বইখানার কথা পূর্বেই শুনেছিলাম, বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কতকটা জানতাম, খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বইখানা আমাকে এমনই আবিষ্ট করেছিল যে, আমি একবার পড়ে নিয়েই বইখানা সংক্ষিপ্তাকারে বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করতে আরম্ভ করলাম। অনুবাদকার্য তখন শেষ হয়েছিল কিনা স্মরণ নেই, এমন সময় একদিন স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নে দেখতে পেলাম, বাবার অসুস্থ সংবাদ পেয়ে

আমি বাবাকে দেখতে এসেছিলাম, হিলির বাড়ির যে কামরায় আমি থাকতাম এবং যেখানে বসে আমি জেকীল ও হাইডের কাহিনী লিখছিলাম সেই কামরার ভিতরে একখানা চৌকির উপরে বিছানায় বাবা খালি গায়ে শুয়ে আছেন এবং ঠিক তদনুরূপ আর একটি শরীর নিয়ে বাবা আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আমি কামরার দ্বারপথে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম; ঘরের ভিতরে চৌকির উপরে বাবার যে মূর্তি শায়িত ছিল বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না।

আমি তখনও সেই মূর্তি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। স্বপ্ন এইখানে এসেই সমাপ্তিলাভ করল। এই ঘটনার প্রায় দশ বৎসর পূর্বেই বাস্তব জগতে আমার বাবার মৃত্যু ঘটেছিল।

চতুর্থ স্বপ্ন

এই স্বপ্নটি বিগত ২৩।২৪শে অক্টোবরের রাত্রির ঘটনা। স্বপ্ন বিবরণ বিবৃত করবার পূর্বে একটু ভূমিকা বলা প্রয়োজন। আমার স্ত্রী বরাবরই গৃহকর্মে নিরলস কর্মী। কাজকর্ম করতে গিয়ে মাত্রাজ্ঞান থাকে না, ফলে এক একবার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে; তখন বিশ্রামের জন্য চলে যান তাঁর দাদার বাড়িতে। তাঁদের বাবা মা বহুদিন গত হয়েছেন। দাদা ডাক্তার। সেখানে সুনির্বাচিত ঔষধপথ্য এবং সর্বোপরি বিশ্রামের ফলে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে স্ত্রী ফিরে

আসেন। বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে এরূপ কয়েকবার ঘটেছে। এখন তাঁর বয়স হয়েছে, তার উপরে পৈতৃক হাঁপানী রোগের সংযোগ; তিনি স্বভাবতঃই ছিলেন কৃশাঙ্গী, এখন খুবই জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায় আছেন, প্রায়ই শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়; শরীরে মেদমাংস নেই বললেই হয়।

স্বপ্ন দেখলাম আমার স্ত্রী আজকালকার স্বাভাবিক শীর্ণদেহে বিছানায় শুয়ে আছেন, তারপর তাঁরই পাশে এসে দেখা দিল আর একটি মূর্তি। দেখলাম আমার স্ত্রীরই পূর্বেকার স্বাস্থ্যবতী মূর্তি, একই ব্যক্তির তুই মূর্তি পাশাপাশি, একজন শায়িত, অপরজন উপবিষ্ট। নূতন মূর্তিটি এসে দেখা দেবার পর থেকে হয়ত ওদিকে আমি আর বিশেষ নজর দিইনি বলেই, আগেকার মূর্তিটি যেন আর আমার দৃষ্টিগোচর রইল না; তবে এটাও ঠিক নূতন মূর্তিটি স্বাধীনভাবেই এসেছিল, আগেকার মূর্তিটি থেকে তার উৎপত্তি ঘটেনি; আগেকার মূর্তিটি বিছানার যে পাশে ছিল, পরবর্তী মূর্তিটি এসেছিল অপর দিক থেকে। স্ত্রীর স্বাস্থ্যবতী নূতন মূর্তি দেখে আমার বেশ আনন্দানুভূতি হল, বেশ মনে আছে, কিন্তু আর একটি মূর্তিও যে পাশে আছে সেজন্য কোন প্রকার বিভ্রান্তি বা অস্বস্তি বোধও হয়নি। ঘরে অন্তত আর একজন লোক ছিল, হয়ত আমাদেরই কোন মেয়ে। কিন্তু খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম বলে মনে পড়ছে না, ঘটনাকাল রাত্রি বলে মনে হয়েছিল, সেজন্য বোধ হয়, সবই কতকটা অস্পষ্ট। আমার স্ত্রীর নূতন মূর্তি হয়ত কারও আহ্বানে,

কারও কথা শুনতে পেয়েছিলেন বলে মনে পড়ছে না, অথবা নিজ প্রয়োজনবোধে বিছানা থেকে উঠে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, আমি তখন ঐ বিছানার উপরেই ছিলাম, এমন সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল, সুতরাং স্বপ্নও টুটে গেল।

এই রাত্রিতে বাস্তব জগতে আমি যে বিছানায় শুয়ে ছিলাম সেই বিছানাতেই স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তি আবির্ভূত হয়েছিল। বাস্তব-ক্ষেত্রে এই ঘরেই আর একটি বিছানায় আমার স্ত্রী শুয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে ছিল আমাদের কন্যা, তার বয়স ৩২ বৎসর।

মন্তব্য

এই চারটি স্বপ্নের মধ্যেই একটি মূল সূত্র দেখতে পাওয়া যায় দ্বৈত ব্যক্তিত্ব Dual Personality ; তার মধ্যে প্রথম স্বপ্নটি অত্যন্ত অসাধারণ, এরূপ আমি কখনও শুনতে পাইনি, কোন দেশের কোন কাব্য উপন্যাসেও পড়িনি। আমার একটি বন্ধু একজন বিজ্ঞানের অধ্যাপক, তিনি শুধু জড়পদার্থ বিজ্ঞানেরই চর্চা করেননি, সুযোগমত তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা করে-ছিলেন। তাঁকে আমার এই স্বপ্নের কথা বলাতে তিনি চমৎকৃত হলেন। তিনি বললেন যে, তিনি কোন মনোবৈজ্ঞানিক বা অনুরূপ কোন গ্রন্থে এরূপ ঘটনার কথা কোথাও পড়েছিলেন,

বিশেষ করে বললেন সে সব গ্রন্থেও উল্লেখ আছে যে, এসব ঘটনা ঘটে in pairs অর্থাৎ দুজন ব্যক্তির সমাবেশ দেখা যায়। কোথায় পড়েছেন তিনি স্মরণ করতে পারলেন না। তাঁর কাছ থেকে আর কোন কিছু আশা করাও চলবে না, কারণ তাঁর স্মৃতি-শক্তির উপর এখন আর নির্ভর করা চলে না, এখন হয়ত তিনি নিজেই মনোবিজ্ঞানের চিকিৎসার পাত্র। কেউ এ বিষয়ে সন্ধান দিতে পারলে একটা ধারা-নির্দেশ পাওয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয় স্বপ্নটির বিশিষ্ট কোন মূল্য আছে বলে হয় না; এটাকে প্রথম স্বপ্নের উপসংহার অথবা তার সহিত কোন প্রকার সংযোগসূত্রে আবদ্ধ মনে করা যেতে পারে।

তৃতীয় স্বপ্নটির সময়ে ডাঃ জেকীল ও মিঃ হাইডের কাহিনী পড়ে এবং লিখতে গিয়ে আমার মস্তিষ্ক এবং চিন্তাধারা দ্বৈত ব্যক্তিত্বের চিন্তায় আচ্ছন্ন, সেইরূপ মানসিক আবহাওয়ার ওরূপ একটি স্বপ্নদর্শন, আন্তরিক হিসাবে যতই আশ্চর্যজনক হোক, ঘটনা হিসাবে অসমঞ্জস হয়নি।

চতুর্থ স্বপ্নের মধ্যে আছে স্বপ্নতত্ত্ব-বিদ্যাবিশারদদের মতবাদের দৃষ্টান্ত যে, আমাদের যে সব আকাঙ্ক্ষার বাস্তবজগতে সার্থকতা লাভ হয় না, তার তৃপ্তি ঘটে অনেক সময়ে স্বপ্নের কল্পজগতে। বর্তমান ক্ষেত্রে আমার স্ত্রীর আগেকার স্বাস্থ্যবতী মূর্তির দর্শন-কামনা হয়ত আমার অবচেতন মনে এবং চেতন মনেও ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠত, তারই একদিন রূপপরিগ্রহ ঘটল স্বপ্নের কল্প-

জগতে, এর একরকম ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া যায় বটে। কিন্তু দ্বৈত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব অসাধারণ ঘটনা সন্দেহ নেই।

কিন্তু প্রথম স্বপ্নটি শুধু অপূর্ব বিস্ময়কর নয়, তত্ত্বহিসাবে দুরবগাহও বটে, প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বেকার স্মৃতি-বিজড়িত দাশর্তা গ্রাম এবং খালই বা কি করে ঘটনার ক্ষেত্ররূপে আবির্ভূত হল সেটাও কম বিস্ময়ের বিষয় নয়।

ছায়া না কায়া

'কাফের'

ছদ্মনামে কাহিনীটা বলছি বলে যেন মনে করবেন না এটা একটা বানানো গল্প। এটা গল্প নয়, সত্যি ঘটনা, আমার নিজের জীবনেই ঘটেছিল।

পনের-ষোল বছর আগের কথা। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে নিশ্চিত ফেল করবো জেনে নিরুদ্বিগ্নে তাস খেলে ও ঘুমিয়ে দিনগুলো কাটাচ্ছি, এমন সময় একদিন খবর এলো কানাই মামার বিয়ে। চিঠি পড়ে সেজো কাকা বললেন—তোমাদের একজনের কারো যাওয়া দরকার।

বড়মামার চিঠিটা দাদা বোধ হয় আগেই লুকিয়ে পড়েছিল। মার্টিনের রেলে চড়ে প্রায় ত্রিশ মাইল গিয়ে, স্টেশন থেকে আরও মাইল পাঁচ-ছয় হেঁটে বা গরুর গাড়িতে এগিয়ে কোন এক অজ পাড়াগাঁয়ে মামার বিয়েব বরযাত্রী হতে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না। 'ও আমার দ্বারা হবে না' বলে সরে পড়লো। সেজো কাকা চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে বললেন— তুমিই তাহলে যেও খোকন। কোথায় কিভাবে যেতে হবে সব ডাইরেকসন দেওয়া আছে চিঠিতে।

আমি বরাবরই দেখেছি বাড়ির যা কিছু ঝামেলা সব আমাকেই পোহাতে হয় শেষ পর্যন্ত, আর দাদা স্বচ্ছন্দে পার পেয়ে যায়। এক তো দাদা হবার গুণে আর দ্বিতীয় বাড়ির সবাই মেনে নিয়েছে যে, 'ওর দ্বারা কোন কাজই না।' সেজো কাকীমাকে কালীঘাটে নিয়ে যেতে হবে। কে নিয়ে যাবে? না খোকন। বুড়ো শিবের মাথায় হাজার-আট বিল্বপত্র চড়াতে হবে। কে তা যোগাড় করবে? না খোকন। কেন দাদা পারে না?—এ প্রশ্ন করার অধিকারও নেই খোকনের। করলেই দাদা তাঁর দাদাগিরি ফলিয়ে যাবে। এক এক সময়ে চোখ ফেটে জল বার হোত আমার।

চিঠি পড়ে দেখলাম বরযাত্রীদের জন্যে একটা বাস রিজার্ভ করা হয়েছে। বাসটা ছাড়বে চারটের সময়। অন্য ব্যবস্থা হোল কদমতলা থেকে পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ বা ৬টা ২৬ ধরা। পলাশডিহি স্টেশনে নামতে হবে। স্টেশনে কন্যাপক্ষের লোক

থাকবে। গরুর গাড়িও থাকবে। লগ্ন আটটা একত্রিশ মিনিটে।

পরদিন পৈতেয় পাওয়া সিল্কের পাঞ্জাবী আর শান্তিপুরী ধুতি পরে সেজো কাকীমার শিশি থেকে রুমালে খানিকটা সেণ্ট ছিটিয়ে কতকটা ইচ্ছায়, কতকটা অনিচ্ছায় মামার বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। ছোটবেলায় মা মারা যাবার পর থেকে মামার বাড়ির সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। কালে-ভদ্রে গেলে ওঁদের সবায়ের আদর যত্নের আতিশয্যে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। মামার বাড়িতে পা দিয়েই পালাই পালাই করতাম। মামার বাড়ি যাওয়াটাও দাদার ও আমার দ্বারা হবে না লিষ্টের অন্তর্গত ছিল। কাজেই দিদিমার 'কি রে আমায় পছন্দ হয়' জাতীয় মর্মান্তিক রসিকতার স্বাদ কোন দিনই গ্রহণ করতে হয়নি তাকে।

আমি সেজো কাকীমার 'খোকন', দিদিমার 'ফেলু।' আমায় দেখে দিদিমা উলু দিয়ে উঠলেন তার পর সুর ধরলেন 'আমার ফেলুবর এসে গেছে, দে গো আমার সাজায়ে দে গো।'

ঠাট্টা তামাসার পালা শেষ হলে শুনলাম বাস এই মাত্র চলে গেছে। বড়মামা বলে গেছেন ভাগ্‌নেরা কেউ এলে সোজা কদমতলা স্টেশনে পাঠিয়ে দিতে, অফিসফেরতা পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ যারা ধরবে তাদের সঙ্গে যেন চলে আসে। উঠতেই দিদিমা বলে উঠলেন—পরের বিয়েতে গিয়ে তোর আর কি লাভ বল ফেলু। বরং বোস আমি একটা পুরুত ডেকে আনি,

আটটা একত্রিশের লগ্নে···। আমি তখন চোখ-মুখ-কান লাল করে বাইরে এসে দাঁড়ালাম মামীদের মুখে আঁচল চাপা দেওয়া খিল্ খিল্ হাসি তখনও থামেনি।

কপালে দুঃখ আছে খণ্ডাবে কে! পথে রাস্তা 'জামে' প্রায় পনের মিনিট আটক পড়লাম। কদমতলা পৌঁছে দেখলাম ট্রেনটা ডিসটাণ্ট সিগনাল পার হয়নি তখনও।

একবার মনে হোল দূর বাড়ি ফিরে যাই। কিন্তু ফিরতে পারলাম না। টিকিট কেটে যে ট্রেনটা ৬টা ২৬শে ছাড়বে সেটায় উঠে বসে রইলাম।

বসে বসে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। ঘুম ভাঙ্গলে দেখি ট্রেন চলছে, আর বাইরে জ্যোৎস্না। ভয়ে ভয়ে একজন যাত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম—দাদা পলাশডিহি কি পার হয়ে গিয়েছে? সে নিতান্ত লির্লিপ্ত ভাবে বললো—না, এই পরের স্টেশনটা। মনে মনে ভাবলাম আর একটু ঘুমালেই হয়েছিল আর কি!

ট্রেন থামলে নেমে পড়লাম। যে কজন যাত্রী নামলো তাদের কাউকে দেখে বরযাত্রী বলে মনে হোল না। ট্রেন ছেড়ে দিল। ক্রমে স্টেশন ফাঁকা হয়ে গেল, স্টেশন-মাস্টার তাঁর অফিস ঘরে তালা লাগিয়ে আমার চোখের সামনেই অন্ধকারে অন্তর্ধান করলেন। আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়েই রইলাম, কি করা উচিত কিছু ঠাহর করতে পারলাম না।

রাগ হোল। প্রথমে নিজের ওপর। তার পর কন্যাপক্ষের

ওপর। কিন্তু রাগ করে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না। টিম টিমে একটা আলো লক্ষ্য করে একটু এগিয়ে দেখলাম দোকানী ঝাঁপ বন্ধ করছে। দাঁড়াতেই জিজ্ঞেস করলো—কি চাই খোকাবাবু?

আমি খদ্দের নেই জেনে তার গলার স্বর বদলে গেল। কিছুই জানে না সে, কাউকেই দেখেনি সে। তবে কোন্ গ্রামে বিয়ে হচ্ছে জানলে সে গ্রামের পথটা বাৎলে দিতে পারে। কোন্ গ্রামে কাদের বাড়ি বিয়ে হচ্ছে তাও জানেন না? তাহলে আর করি কি বলুন। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে সেও সরে পড়ল।

কোন্ গ্রামে কাদের বাড়ি বিয়ে হচ্ছে বড়মামার চিঠিতে তার উল্লেখ ছিল না। সে সম্বন্ধে কোন কৌতূহল জাগে নি কাজেই মামার বাড়িতে জিজ্ঞাসা করেও নিই নি। নিজেকে খুব বেকুব মনে হোল। একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার অবস্থাটা অনুমান করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে স্টেশন। করগেট টিনের স্টেশন ঘরটা ছাড়া দ্বিতীয় ঘর হোল এই চালা দোকানটা। কাছাকাছি গ্রাম নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সে কোথায় বা কতদূরে তার কোন চিহ্ন চোখে পড়ে না, কোন আন্দাজও হয় না। জ্যোৎস্নার আলোর সঙ্গে ধোঁয়া মিশে কুয়াশার সৃষ্টি করেছে চারদিকে। মধ্যে মধ্যে কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে বটে, কিন্তু সে ডাক কোন্ দিক থেকে এবং কতদূর থেকে আসছে তা ঠিক ঠাহর হচ্ছে না। একদিকে স্টেশনমাস্টার গেল দোকানী গেল, অন্য

দিকে। কি করি এখন? এরই যে কোন একটা দিক লক্ষ্য করে এগবো, না স্টেশনেই অপেক্ষা করব! আমি আসিনি দেখে বড়-মামা কি স্টেশনে লোক পাঠাবে? কিন্তু বড়মামা জানবে কি করে আমি পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ ফেল করে ৬টা ২৬-এ এসেছি!

কি করব সাত-পাঁচ ভাবছি এমন সময় সামনে একটা ছায়া-মত কি দেখে চমকে উঠলাম। না ছায়া নয়, একটা লোক। লোকটা এগিয়ে এসে দাঁড়াল আমার মুখোমুখি।

'আপনি কি ঘোষালদের বাড়ির বরযাত্র আছো?' বলার সঙ্গে সঙ্গে সে হেঁ হেঁ করে উঠল, তার কালো মুখের শাদা দাঁত-গুলো ঝক্ ঝক্ করে উঠল। ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম আমি। কিন্তু রাগকে চেপে গম্ভীরভাবে বললাম—হ্যাঁ।

সে আবার হেঁ হেঁ করে উঠল—তবে চলেন আমার সঙ্গে। বলে সে মুখ ঘুরিয়ে এগুলো। আমিও দ্বিরুক্তি না করে তার পিছু নিলাম।

আজ পনের-ষোল বছর পরে সেদিন সেই মুহূর্তে দেখা লোকটার মুখের চেহারা বা শরীরের গঠন আমার স্পষ্ট মনে পড়ে না। তবে তার কালো মুখে ঝক্‌ঝকে দাঁত ও কথার সঙ্গে টেনে হেঁ হেঁ হাসি আজও ভুলতে পারি নি। লোকটার গায়ে জামা ছিল, কি পায়ে জুতো ছিল না মনে নেই, তবে তার পরনের ধুতিটা ছিল পরিষ্কার আর সে কুঁজো হয়ে হাঁটছিল। এইটুকু মনে করতে পারি।

লোকটা যে দায়িত্বজ্ঞানহীন সে সম্পর্কে আমার কোন

সন্দেহ রইল না। স্টেশনে আসবার পথে কোথাও হয়তো গাঁজার আড্ডায় বসে গিয়েছিল। কিন্তু লোকটা না এলে আমার কি দুর্গতি হত সে কথা ভেবে লোকটাকে আমি ক্ষমা করলাম। শুধু জিজ্ঞেস করলাম—কতটা হাঁটতে হবে? সে বলল—এই সামনে।

সাধারণের চেয়ে একটু বেশি জোরে হাঁটতে পারি বলে আমার মনে মনে গর্ব ছিল। দেখলাম এ লোকটা বেশ জোরেই হাঁটে। অবশ্য পথটা গ্রাম্য মেটে পথ না হলে কি হত বলা যায় না। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটা ও আমার মধ্যে কিছুটা ব্যবধানের সৃষ্টি হল এবং তার পরনের সাদা ধুতিটা লক্ষ্য করে আমি এগোতে লাগলাম। মাইল দুই চলে দেখলাম ব্যবধানটা ক্রমশই বাড়ছে। একবার জোরে একটা হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে ডাকলাম—ও কর্তা, একটু দাঁড়াও। কিন্তু আমার ডাক লোকটার কানে গেল বলে মনে হল না। পাছে লোকটাকে হারিয়ে ফেলি এই ভয়ে আরও জোরে হাঁটতে শুরু করলাম। সাদা কাপড়পরা একটা লোক আমার থেকে আধ কি এক ফার্লং দূরে হন হন করে এগুচ্ছে এবং পাছে সে ধোঁয়ার মধ্যে হারিয়ে যায় এই ভয়ে তাকে লক্ষ্য করে আমিও ছোটার বেগে হাঁটছি —এই টুকুই শুধু মনে পড়ে সে রাত্রের ঘটনার।

জ্ঞান হলে চোখ মেলে দেখি দিনের আলোয় এক ঘর অপরিচিত লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে একটা মাদুরের ওপর আমি শুয়ে। আমায় চোখ মেলতে দেখে একটি প্রৌঢ়

লোক, ডাক্তার বলেই বোধ হল একটা চটা ওঠা কলায়ের কাপে খানিকটা ওষুধ ঢেলে তাতে জল মিশিয়ে মিষ্টি সুরে বললেন—খোকা, এটা খেয়ে ফেলো তো লক্ষ্মীটি। মিষ্টি মিষ্টি কিন্তু বেশ ঝাঁজওলা ওষুধটা এক ঢোকে খেয়ে ফেললাম। এর পর এল এক বাটি গরম দুধ। আমি বললাম—আমি কোথায়? প্রৌঢ় লোকটি বললেন—বলছি সব, আগে এটা খেয়ে ফেল। দুধ খেতে উঠে বসলাম, তারপর একটু একটু করে সব মনে পড়ল। দুধ খেতে খেতে শুনলাম—একজন চাষী ভোর থাকতে উঠে মাঠে যাবার পথে আমায় দেখতে পায় একটা আলের ধারে মুখ থুবড়ে পড়ে আছি। কাঁধে তুলে সে নিয়ে আসে।

গরম দুধে চুমুক দিতে দিতে আমি মনে মনে একটা জিনিস ঠিক করে নিই যে, এই অপরিচিত লোকগুলোর কাছে গত রাত্রের সব ঘটনা বলা ঠিক হবে না। বললাম শুধু যে পলাশডিহিতে একটা বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে এসেছিলাম, মাঠে বার হয়েছি এমন সময় কুকুরে তাড়া করে, হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম, তারপর আর মনে নেই।

প্রৌঢ় লোকটি হো হো করে হেসে উঠলেন। পলাশডিহি এসেছিলে নেমন্তন্ন খেতে? পলাশডিহি এখান থেকে ক'মাইল হবে জানো? ২৫।৩০ মাইলের কম নয়। কুকুরের তাড়া খেয়ে ২৫।৩০ মাইল তুমি ছুটে এলে? হাসতে হাসতে তাঁর বাঁধানো দাঁতের এক পাটি খুলে গেল।

হাসি থামিয়ে তিনি বললেন—তুমি প্রাণে বেঁচেছো এই

ঢের, এখন কেমন বোধ করছো ? চলতে পারবে ? চলো আমার কাঁধে ভর দিয়ে এই কাছেই আমার বাড়ি। নেয়ে-খেয়ে আরাম করে ঘুমিয়ে নাও তারপর তোমার গল্প শোনা যাবে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর তিনি আমার কাছ থেকে আনুপূর্বিক সব শুনে বললেন—দেখ, আমি ডাক্তার মানুষ, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করি না। তোমাকেও বিশ্বাস করতে বলি না। তবে বুঝলে কিনা, অনেক সময় এমন অনেক সব ঘটনা ঘটে সহজ বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। তোমারটাও হয়তো তাই।

পরদিন বাড়ি ফিরলে সেজোকাকীমা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নতুন মামী কেমন হয়েছে খোকন ?

বললাম—চলনসই।

কানাই মামার বৌভাতে যেতে বড়মামা বললেন—ফেলু, তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ। দিদিমা তোমার সঙ্গে কি তামাসা করেছে আর তুমি রেগে সটান বাড়ি ফিরে গেলে ?

সে রাত্রের সেই কাহিনী বাড়িতে বা মামার বাড়িতে কাউকে বলিনি। সেদিন সেই প্রৌঢ় ডাক্তারটিকে বলেছিলাম, আর আজ আপনাদের বলছি। ঘটনাটার পর ১৫।১৬ বছর কেটে গেছে, কিন্তু আজও মধ্যে মধ্যে ভাবি কে ছিল সেই লোকটি ?

অজানা অতিথি

লিলি দে

যে ঘটনাটির কথা আজ লিখছি তার সাক্ষী আজ পৃথিবীতে আমরা দুজন। ঘটনার কাল থেকে আজ পর্যন্ত আমার বুদ্ধির অনধিগম্য যে বস্তুটি রাত্রির বিরামহীন প্রহরে আমার দেহে শিহরণ জাগায়, তার কথা আজ পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি।

স্থান, কাল ও পাত্র অতি সাধারণ নয়। প্রথমত আমাদের বাড়িটি উত্তর কলকাতার কোন এক অঞ্চলে জীর্ণ ও পুরানো দিনের ধ্বংসাবশেষের মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিটি জীর্ণ ফাটলে, বড় বড় থামে নবাবী আমলের দম্ভ আর বঞ্চনা

নিয়ে উপহাস করত বিংশ শতাব্দীর আমাদের জীবনযাত্রাকে। এদিক থেকে ওদিক অবধি একা যাওয়ার সাহস রাতের অন্ধকারে দুঃসাহসীকেও কাঁপিয়ে তুলত। ঘরগুলো ও দরদালান পার হয়ে বিরাট ছাদের মাঝে একাকিত্বকে সম্ভোগ করার বিলাস কাব্যের কথায় সম্ভব হলেও, বাস্তবে আমাদের মনে কোনদিন ঠাঁই পায় নি।

যাই হোক, ঘটনাটির বর্ণনা আরও আশ্চর্যজনক। ঘটনাটির প্রথম শুরুতে যে পরিবেশ ছিল সে কথা বলা উচিত। চারদিকে অন্ধকার, রাত্রি তখন ১১টা, ঘরের ভিতর আছি আমি, আমার অসুস্থ কোন এক আত্মীয় ও তাঁর নার্স। রাত্রে প্রয়োজন অপ্রয়োজনে বাইরে সীমাহীন অন্ধকারের ভিতর যাওয়া বা লোকজনকে ডেকে ফেব্রুয়ারীর শীতে ফরমাস করা কোনটাই যে সুখের নয় একথা অত্যান্ত সত্য। ঘরের আলো ছাড়া ঠিক ছাদের উপরে কোন আলোর বন্দোবস্ত করা সম্ভবপর ছিল না, আমিই কেবলমাত্র অভ্যাস ও অত্যধিক সাহসের জোরে বাহির আর অন্দর মহলের যোগাযোগ রাখতাম।

সেদিন ঘরের ভিতর একা ছিলাম না, সুতরাং সামনের দরজাগুলি খোলা, ছাদের আর এক সীমা পর্যন্ত নিষ্প্রাণ আলোয় দেখা যাচ্ছে। আলো গিয়ে যে পাঁচিলের ধারে শেষ হয়েছে, তার অপরদিকে কোন মানুষেরই বসতি নেই, এবং কোন মানুষের পক্ষেই সেই তিনতলা খাড়াই পাঁচিলের উপর ওঠা সম্ভব নয়। সেই রাত্রি ১১টার সময় হঠাৎ চমকে উঠে নার্সটি

আমাকে বললেন, 'দেখুন, দেখুন, আপনাদের পাঁচিলের উপর কে যেন পা ঝুলিয়ে বসে আছে।' আমার সমস্ত শরীর দিয়ে একটি শীতল স্রোত বয়ে গেল যখন দেখলাম আশ্চর্যরকম দুটি পা ইলেকট্রিকের আলোর প্রত্যন্ত সীমায় ঝোলান অবস্থায় বিশ্রাম-রত। বাইরে জ্যোৎস্নার কোন জোর নেই, কিন্তু আলোর খানিকটা আভা আছে, তার ভিতরে দৃষ্টি চালিয়ে কোন সশরী-রীকে পাঁচিলের উপর দেখতে পেলাম না। তাডাতাড়ি অন্য-দিকের দরজা দিয়ে চাকরবাকরদের ডাক দিয়ে খোঁজ করতে বলে সকলের কাছে আমরা দুজন হাস্যাস্পদ হয়ে দাঁড়ালাম। এই ঘটনার ঠিক চার দিন পরে আমি পরিষ্কারভাবে আর এক রাত্রিতে ঐ পায়ের উপস্থিতি লক্ষ্য করলাম। চোখের ভুল মনে করে নার্স'কে ডাকলাম, কিন্তু ঐ দেখে ভয়ের যেরকম পরিণতি তিনি দেখালেন তার ফলে খানিকক্ষণ বাতাস করা ও জল চাপড়ানো ছাড়া আর গত্যন্তর দেখলাম না। এই চার-দিনের ভিতর অতি সাধারণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিটি অমানুষিক গতিতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চললেন। ডাক্তার, নার্স ও আমাদের সমবেত প্রচেষ্টা যে কিভাবে নিষ্ফল হ'ল সে কথা ভাবলেও আমরা অবাক হয়ে যাই। চতুর্থদিন রাত্রে ঐ সুন্দর পা দুটি দেখার পর হ'তে আর ঐ দিকের দরজা খুলি নি। কিন্তু রোগীর অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হতেই থাকল। পরের দিন সন্ধ্যার পর ডাক্তার এসে হঠাৎ আশা দিলেন রোগীর জীবন সম্বন্ধে, বললেন, 'আজ রাত্রিটা কাটলেই একেবারে ভাল হয়ে

যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।' সমস্ত মনটা নিজের সার্থক খাটুনীর প্রশংসায় আনন্দিত হয়ে উঠেছে, আমার ঘরে ফিরে আসার সময় হয়েছে, এমন সময় হঠাৎ খবর পেলাম রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। ছুটে গেলাম ঘরের দিকে, দরজা পেরিয়ে সর্বাগ্রে চোখ পড়ল ছাদের ওপারে, সেখানে আবার সেই পায়ের চিহ্ন পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলাম। দরজাটি তাড়াতাড়ি বন্ধ করে ঘরের দক্ষিণদিকের ছাদে চলে এলাম। ডাক্তারের কাছে খবর দিয়েছি, উত্তেজনায় পায়চারি করতে করতে দেখলাম একটি আশ্চর্যরকম আলো ঘরের ভিতরের ছাদের এক জায়গায় পড়েছে। আলোটি জ্যোতিহীন, কিন্তু সত্যি অতি বিস্ময়ের ব্যাপার যে বিদ্যুতের আলোকে ক্ষণিকের জন্যও ম্লান না করে উপরের ছাদকে এক জায়গায় আলোকিত করছে। আমার স্বামী উত্তেজিত হয়ে বাইরে গেলেন,কিন্তু আলোর উৎস কোথাও দেখতে না পেয়ে ফিরে এলেন, অথচ ঘরসুদ্ধ আমরা সকলেই আলোটির অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছিলাম। আকাশে তখনও ম্লান চাঁদের আলো রয়েছে, আমি খোলা হাওয়ায় ছাদে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না যখন দেখলাম, ঠিক আমার সঙ্গে পা মিলিয়ে ছাদের অপর দিকে কে যেন পায়চারি করেই চলেছে। একবার নয়, দুবার নয়, সেই প্রায় অশরীরী পদাতিকের দিকে—আমার দৃষ্টি ফিরল কিন্তু তাঁর ত্রুটিহীনভাবে একই ছন্দে পায়চারি করার যেন শেষ নেই। ঘরের ভিতর ছুটে পালিয়ে এলাম, এসে যা দেখলাম—তার ফলে আমার সমস্ত

স্নায়ু বিকল হয়ে যাবার মত হ'ল, সম্পূর্ণ সামলে যাওয়া রোগী চিরকালের মত আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে। মনের সমস্ত শক্তিকে এক করে বাইরে ছুটে এসে সেই অশরীরী সঞ্চারমানা দেহ বা সেই আলো কিছুই দেখলাম না। অপর-দিকে ছাদের পাঁচিলের উপর থেকে সুন্দর সেই পা দুটিই অদৃশ্য হয়েছে দেখতে পেলাম। আমার সমস্ত বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়ে যাবার মত হল। এই ঘটনার কিছুদিন পরই আমরা কলকাতার অন্য অঞ্চলে চলে গেলাম। একই সঙ্গে ঘটে যাওয়া এই তিনটি ঘটনার কোন সামঞ্জস্য আমার চোখে ধরা পড়ে নি। এর অন্তরালে যে কিসের কারচুপী লুকিয়ে ছিল আজও আমার বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হইনি। জানি না ভবিষ্যতের কোন একদিন এর রহস্য উদঘাটিত করে বুদ্ধিজীবীরা আমার বিচারবুদ্ধিকে সংশয়মুক্ত করতে সক্ষম হবেন কিনা।

তিন খুন

সমরেন্দ্রকিশোর বসু

ঘটনাটি ঘটেছিল আমাদের পারিবারিক পরিবেষ্টনীর মধ্যেই ফরিদপুর জেলার প্রসিদ্ধ পালং গ্রামে ১৯২৮ অব্দের ১৪ই এপ্রিল।

আমার ছোট কাকা নগেন্দ্রভূষণ বসুর হৃদয়ের উদারতা ও অতিথিপরায়ণতা প্রসিদ্ধ ছিল। যে কোনো অবস্থায় যে কোনো পরিচিত মানুষ তাঁর বাড়িতে গেলে সমাদরের ত্রুটি ঘটত না। এজন্য প্রায় প্রত্যহই তাঁর সংসারে বন্ধু-সমাগম হত। বিশেষত তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ খেলোয়াড়; দেশী-বিদেশী যাবতীয় খেলা

থেকে শুরু করে দৌড়-লাফ ইত্যাদির এমন কোনো ক্ষেত্র ছিল না, যেখানে কেউ তাঁকে হঠাৎ পরাজিত করতে পারত! ৪০ বছরের কাছে যখন তাঁর বয়স, তখনো তিনি অনায়াসে ৫ ফুট দেয়াল বা ২০ ফুট জমি লাফিয়ে যেতে পারতেন। তাঁর অকপট ও সহৃদয় ব্যবহারের জন্য তিনি এত বেশি জনপ্রিয় হতে পেরেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরে বহু শোকসভা ও স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং অনেকগুলো গ্রাম্য গাথাও তৈরি হয়েছিল। বৈরাগী, ভিক্ষুকরা সে গাথা গেয়ে ভিক্ষাও করত।

পাংলংয়ে আমার ছোট কাকা ও বড় কাকা শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসুর পরিবার বরাবরই যুক্তভাবে ছিল। পরে আমার এক পিসেমশায়ের বাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনিও আমার কাকাদের আশ্রয়ে আসেন। তাঁর নাম ছিল বিপিনবিহারী কর। তিনি কাকাদের বাড়িতেই ঘর করে স্থায়ীভাবে সংসার পেতেছিলেন। আরো কিছু কাল পরে এক সময়ে পিসেমশাই আসামের চাকরি হারিয়ে বাড়ি এসে বসেন। তখন তাঁর পরিবারে তিনি ছাড়াও পিসিমা এবং তাঁদের দুটি মেয়ে বর্তমান। এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে, এই উভয় কাকাই ছিলেন আমার বাবার আপন খুড়াত ভাই এবং পিসিমা ছিলেন তাঁদেরই সহোদরা। সে যা হোক, পিসেমশায় চাকরি হারালেও তাঁর বা তাঁর পরিবারস্থ কারু সমাদরই আমার কাকাদের সংসারে নষ্ট হয় নি। কেননা আমার বড় কাকা এবং কাকীমায়েরাও যথেষ্ট অতিথিবৎসল ছিলেন।

আমার বড় কাকা তখন ময়মনসিং সহরে মুক্তাগাছার জমিদার রাজা জগতকিশোর আচার্য চৌধুরীর আটআনি কাছারিতে কাজ করতেন; তাঁর ঔষধপত্রের ব্যবসাও ছিল। আর ছোট কাকারও ঔষধপত্রের ব্যবসা ছিল এবং নানা হাট-বাজারে তিনি অস্থায়ী দোকানদারিও করতেন। বিভিন্ন মেলায়ও তিনি দোকান খুলতেন।

১৯২৮ অব্দের ১৪ই এপ্রিল ছিল বাংলা ১৩৩৫ সনের ১লা বৈশাখ। সাধারণতঃ বাঙালীরা এ দিনটিকে শুভ দিন মনে করে এবং এরূপ দিনে পূর্ববঙ্গের বহু জায়গায় চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে মেলা বসে। এই সব মেলা সেখানে 'গলুইয়া', নামে খ্যাত। উল্লিখিত তারিখে পালংয়ের পার্শ্ববর্তী বিলাসখানা গ্রামে 'গলুইয়া' ছিল। ছোট কাকা খুব ভোর বেলায়ই মালপত্র মেলায় পাঠিয়ে দেবার পরে দেখলেন আমার পিসেমশায় তাঁর পশ্চিমের ঘরে তক্তাপোষের ওপর গুম হয়ে বসে কি যেন ভাবছেন। কাকাবাবু মনে করলেন পয়সা-কড়ির অভাবে বোধ হয় বাচ্চা কাচ্চাদের পার্বণীর আব্দার রক্ষা করতে না পেরে তাঁর মন খারাপ হয়ে গেছে। কাজেই তাঁর মনকে চাঙ্গা করার জন্য তিনি হেসে বললেন, 'এ কি কর মশায়, আজকের দিনেও এমনি ভাবে থাকতে হয় না কি? ছেলে-পিলেদের এই সব পয়সাকড়ি দিন, তাদের নিয়ে গলুইয়ায় যান, দেখুন কে কি কিনতে চায় বা পছন্দ করে।'—এই বলেই তিনি সেই ঘরের দাওয়ায় বসে উবু হয়ে কাকে কত দিতে হবে সেই পয়সা গুণে

গুণে ভাগ করতে লাগলেন।

এখন কাকাবাবু যেখানে বসেছিলেন, সেখান থেকে পিসেমশায়ের তক্তাপোষের দূরত্ব ৪।৫ হাতের বেশী ছিল না; মাঝখানে ছিল দরজা এবং সে দরজা খোলাই ছিল। হঠাৎ মাথায় কি হোল, কে জানে, পাশ থেকে বাটনাবাটার একটা ভারী নোড়া তুলে নিয়ে কাকাবাবুর সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে তাঁর ঠিক ঘাড়ের ওপর এক সাংঘাতিক এবং মারাত্মক আঘাত করলেন এবং তার অনিবার্য পরিণামে কাকাবাবু নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়লেন। কাকাবাবুর মা অর্থাৎ আমার ছোট ঠাকুরমা তখন উঠোনেই ছিলেন। ব্যাপারটা স্পষ্ট দেখেও তিনি প্রথমটা কিছুই অনুধাবন করতে পারলেন না; কিন্তু পরক্ষণেই পিসে-মশায়কে একখানা দা দিয়ে সংজ্ঞাহীন কাকাবাবুর মাথায় উপর্যুপরি আঘাত করতে দেখে তিনি চীৎকার করে উঠলেন। তাঁর কাছেই কাকাবাবুর মেজ ছেলে বছর ছয়ের শান্তি বসে খেলা করছিল; সে-ও চীৎকার করে উঠল।

মুহূর্তে পিসেমশায়ের দৃষ্টি গেল সেই দিকে। সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে দাওয়া থেকে উঠোনে পড়ে তিনি সেই দা দিয়েই তার মাথায় এক আঘাত করলেন যার ফলে দায়ের ডগাটা তার মাথার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। তথাপি, প্রাণের ভয়ে আর্তনাদ করতে করতে শান্তি সদর উঠোন থেকে অন্দরের উঠোনে ছুটে যায়। সেই সময় ছোট কাকীমা রান্না ঘরে তাঁর তৃতীয় ছেলে ৪ বছরের নিরঞ্জনের খাবার ব্যবস্থা করছিলেন। এই ছেলেটি

এর পূর্বে দিন কয়েক অসুখে ভুগেছিল এবং সেই দিনই তাকে ভাত পথ্য দেবার কথা ছিল। কাকীমা এই জন্যই সেদিন সমস্ত কাজ ফেলে ভোর বেলাতেই তার জন্য ভাত রেঁধেছিলেন এবং নিরঞ্জনকে খেতে দেবার পূর্ব মুহূর্তেই এই ঘটনা ঘটল।

যাহোক, ছোট কাকীমা ব্যাপার কি দেখবার জন্য নিরঞ্জনকে কোলে নিয়েই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং বেরিয়েই দেখলেন, শান্তির মাথা কপাল ও গাল বেয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত নেমে আসছে আর মাথার একটা জায়গা থেকে খানিকটা সাদা মগজ বেরিয়ে পড়েছে এবং তার প্রায় পেছনে পেছনেই রক্তাক্ত দা হাতে রুদ্র মূর্তিতে পিসেমশায় ছুটে এসেছেন। একান্ত অসহায়ের মতো শান্তি তখন কাকীমাকে জড়িয়ে ধরলেন। এবং কাকীমাও 'একি হোল, একি হোল' বলতে বলতে ডান হাতে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই পিসেমশায় বাঁ হাতে কাকীমার বিশ্লথ কোল থেকে হ্যাচকা টানে রুগ্ন নিরঞ্জনকে ছিনিয়ে আনেন এবং অনেকটা শূন্যে ঝুলিয়ে ধরেই তার ঘাড়ে কোপ মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

এই নূতন অঘটনে মুহূর্তের জন্য শান্তির দিক থেকে কাকীমার মনঃস্খলিত হয়ে গিয়েছিল নিরঞ্জনের ওপর। সেই মুহূর্তেই পিসেমশায় শান্তিকেও ছিনিয়ে নেবার জন্য টান দিলেন। কাকীমা দুহাতে শান্তিকে জড়িয়ে ধরলেন বটে, কিন্তু একজন ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত পুরুষের কাছে তাঁর সেই চেষ্টা অতি অকিঞ্চিৎকর ছিল। তাই তাঁর দু'হাতের প্রাণপণ বেষ্টনী

থেকেও একটি হ্যাঁচ্‌কা টানেই শান্তিকে সরিয়ে নিয়ে পিসে-মশায় তার ঘাড়ে দ্বিতীয় আঘাত করলেন। শান্তি সেখানেই লুটিয়ে পড়ল।

কিন্তু ঘটনার সমাপ্তি এখানেই ঘটল না; পিসেমশায় ছোট কাকার বড় ছেলে রণেনকে তখন খুঁজতে লাগলেন, এবং চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'ওর (অর্থাৎ ছোট কাকার) বংশে বাতি দিতে কাকেও রাখবো না।' সৌভাগ্যক্রমে রণেন সে সময়ে বাড়ির বাইরে ডাক্তারের বাড়ি গিয়েছিল ছোট ভাইয়ের খবর দেবার জন্য! তা ছাড়া পিসেমশায় তাঁকে দু-এক মুহূর্তের বেশীও খোঁজেননি; রণেন্দ্র বিজয়কে না পেয়ে পিসেমশায় ফের কাকাকেই আক্রমণ করলেন। বলা বাহুল্য কাকাবাবু তখনো অচৈতন্য অস্বস্থায় মাটিতে প'ড়ে ছটফট করছিলেন এবং তাঁর মাথার অনেকগুলো ক্ষতস্থান থেকে ঝলক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে দাওয়া ভাসিয়ে উঠোনে পড়ছিল।

ইতিমধ্যে ঠাকুরমা ও কাকীমার আর্ত চীৎকারে উত্তরের ঘর থেকে বড় কাকীমা ও তাঁর মেয়ে সুমতি বেরিয়ে আসে এবং অন্দরের পুকুরঘাট থেকে পিসিমাও এসে পড়েন। ছোট ছোট ছেলে-পিলেরা ভয়ে ভয়ে দূরে সরে গিয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে, সমর্থ বা বয়স্ক পুরুষ সে সময়ে বিশেষ কেউ ছিল না এবং তাদের অনেকেই তখন গলুইয়ায় গিয়েছিল। একটি যুবক ছেলে এগিয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু তারদিকে দা উঁচিয়ে তুলতেই

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না।

সে পালাতে বাধ্য হয়। পিসিমা প্রথমটা হতচকিত হলেও পর-মুহূর্তেই যে কোনও ঝক্কি সাপক্ষে প্রাণপণ চেষ্টায় পিসেমশায়ের হাত থেকে দাটাকে কেড়ে নিতে সমর্থ হন এবং মাত্র ১৪ বছরের মেয়ে হ'লেও সুমতি সেই পরিত্যক্ত নোড়াটা পিসেমশায়ের পিঠে ছুঁড়ে মেরেছিল। পিসিমায়ের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত পিসেমশায় বাগ মানেন এবং একদম গুম হয়ে বসে পড়লেন।

এই ঘটনাটি যত বীভৎসই হোক এবং যতই কেন রোমাঞ্চকর ও দুঃসাধ্য হোক ঘটতে বেশী সময় লাগেনি; মাত্র ৫ মিনিটেরও কম সময়ে এর শুরু ও শেষ হয়েছিল। এই দুর্ঘটনার ফলে শান্তি ও নিরঞ্জন তখুনি মারা যায় এবং ছোট কাকা অজ্ঞান অবস্থায় তৃতীয় দিনে অর্থাৎ ১৬ই এপ্রিল মাদারিপুরের সদর হাসপাতালে মারা যান। ঘটনার অব্যবহিত পরেই দেখতে দেখতে চারদিক থেকে বহু শত লোক এসে বাড়ি ছেয়ে ফেলল। থানা মাত্র ৫।৬ মিনিটের পথ; অতএব পুলিসও এসে পড়ল তখুনি। হাজার কণ্ঠে একই প্রশ্ন বার বার উচ্চারিত হ'তে লাগল, 'একি ব্যাপার! নগেনবাবু কি বলেছিলেন, কি করেছিলেন তিনি? বাচ্চারাই বা কি করেছিল?' কিন্তু এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়নি কোনো দিনই।

সেই সময় বাংলা দেশের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকায়ই এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত বিবরণ বেরিয়েছিল এবং জন-সাধারণের মধ্যেও এই খুনের কারণ জানবার জন্য প্রবল ঔৎসুক্য

জেগেছিল ; দূর দূর থেকেও বহু লোক পালংয়ে গিয়েছিল ; আর পুলিসী তদন্তের তো কথাই ছিল না। কেউ কেউ বললেন, ভেতরে ভেতরে হয়তো নগেনবাবুর সঙ্গে কোনো কারণে বিপিন বাবুর মনোমালিন্য বা শত্রুতা ছিল এবং এক সুযোগে বিপিনবাবু তা কড়ায়-গণ্ডায় হাসিল করলেন। কিন্তু কি নিয়ে সেই শত্রুতা ঘটতে পারে ? অথবা নারী ঘটিত ব্যাপার নিয়ে কি ? এ প্রশ্নের জবাব ছিল না ; পরিচিত আত্মীয়-অনাত্মীয়ের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তিই ছিলেন না যিনি এ বিষয়ের কিছু মাত্র আলোকপাত করতে পারেন। বস্তুতঃ সে ধরনের কোনো ব্যাপার থাকলে সেকথা নিশ্চিন্ত-ভাবেই কোর্টে উঠে যেত ; কেন না সে ধরনের একটা সন্দেহ পুলিসের মনে জেগেছিল এবং তা জাগাই স্বাভাবিক।

কিন্তু অধিকাংশই মনে করতে লাগলেন অন্য রকম অর্থাৎ যে কারণেই হোক, পিসেমশায়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। অবশ্য এই ধারণার সমর্থনে সামান্য সামান্য নজীর বর্তমান ছিল; যেমন, আসামের চাকরি যাবার পরেও পিসেমশায় হঠাৎ বাড়ি আসেন নি এবং কোনো এক জুচ্চোরের পাল্লায় পড়ে তাঁর কিছু টাকাকড়ি সেখানে মারা যাবার পরেও তা উদ্ধারের জন্য তিনি অব্যবস্থিত চিত্তের (?) মত ছুটোছুটি করছিলেন। শেষে ছোট-কাকার পুনঃ পুনঃ চিঠিতে তিনি বাড়ি এসেও দিন-রাত চুপচাপ বসেই থাকতেন। তাঁর এই ভাগ্য-বিপর্যয়ে কাকারা আন্তরিক-ভাবে তাঁকে বল-ভরসা দিলেও তাঁর মন আর পূর্বের মত চাঙ্গা

হয়ে ওঠেনি ইত্যাদি। কিন্তু দুর্ঘটনার পূর্বে পিসেমশায়ের মস্তিষ্ক বিকৃতির বিষয়ে ওসব নজীর তোলা চললেও পরে সে ধরনের কোন নজীর দেখানো চলে নি। দুর্ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরে তিনি নিজেই শোকে মুহ্যমান হয়ে বলেছিলেন, 'একি করলাম ! আমার ফাঁসি হওয়াই উচিত।' আত্মীয়-পরিজনরা যখন দেখলেন ঘটনার পেছনে কোন রকম পূর্ব-অভিসন্ধি বা ষড়যন্ত্র নেই এবং ওটা একান্তই বুদ্ধির অগম্য ও আকস্মিক, তখন একমাত্র ছোট কাকীমা ছাড়া প্রায় সকলেই পিসেমশায়ের মুক্তির জন্য সচেষ্ট হন। তাঁরা একদিকে যেমন পিসেমশায়কে 'পাগল' প্রমাণের জন্য চেষ্টিত হন, অন্যদিকে তেমনি ছোট কাকীমাকে নিরপেক্ষ সাক্ষ্যদানে রাজী করানোর চেষ্টা করতে থাকেন।

ছোট কাকীমার তখন সাংঘাতিক অবস্থা ; এত বড় শোককে ভোলা এক রকম অসম্ভব ব্যাপার ছিল ; সেই দুঃসময়ে পালং-এর প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক কর্মী শ্রীযুক্ত রণেশচন্দ্র চক্রবর্তী অহরহ কাছে থেকে নানা ধরনের প্রবোধ দিয়ে এবং রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক বহু বই পড়িয়ে পড়িয়ে কাকীমার মনকে অনেকটা প্রশমিত করেছিলেন। রণেশদা এখন কলিকাতায়ই আছেন। সেই সময়ে রাজনৈতিক আদর্শ আমাদের এক হলেও এখন সম্পূর্ণরূপে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছি আদর্শের সংঘাতে। তবু তাঁর তখনকার নিঃস্বার্থ কার্যাবলীর জন্য আমি তাঁকে মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করি। আজো অন্তরের দিক থেকে আমরা একে অন্যের ওপর মমতাসম্পন্ন আছি, একথা বলাই বাহুল্য।

যা হোক, অবশেষে পিসেমশায় মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে ফাঁসি থেকে রেহাই পেলেও তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে রাচীর পাগলা গারদে যেতে হয়েছিল। অবশ্য, মামলা চলার সময়ে লোকের পরামর্শ অনুসারে পিসেমশায়ও আদালত কক্ষে উপস্থিত হয়ে পাগলামীর ভান করতেন। সেই কারণে তাঁর ওপর ছোট কাকীমার যথেষ্ট রাগ এবং আক্রোশও ছিল।

কিন্তু ঘটনার বৈচিত্র্য ও বিস্ময় এখানেই শেষ হয় নি।

পিসেমশায়কে কয়েক বছর উন্মাদাশ্রমে থাকতে হয়েছিল এবং সেই সময়ে তিনি আমার আর এক পিসিমায়ের মারফত লুকিয়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে অর্থাৎ আমার প্রথমোক্ত পিসিমায়ের কাছে চিঠিপত্রও লিখতেন। তাঁর নিশ্চিত ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, এই জীবনে আর তাঁর মুক্তি হবে না এবং একদিন এই পাগলা গারদের মধ্যেই তাঁকে ইহলীলা সাঙ্গ করতে হবে। কিন্তু দীর্ঘদিনের মধ্যেও যখন কর্তৃপক্ষ তাঁর মধ্যে পাগলামীর কোন লক্ষণ দেখতে পেলেন না, তখন তাঁরা তাঁকে মুক্তি দেওয়াই স্থির করলেন।

মুক্তির দিনে কর্তৃপক্ষ যখন পিসেমশায়কে সেই কথা জানিয়ে বাইরে আসতে নির্দেশ দেন, তখন কেমন যেন বিস্ময় বিমূঢ়ের মতো তাঁর মুখ দিয়ে অস্ফুটে একটি কথা বেরোল— 'অ্যা! আমি মুক্ত?' পরক্ষণেই তিনি আরো অভিভূত হয়ে বললেন, 'আমার শরীর কেমন করছে, আমায় ধরুন' এবং একথা বল্‌তে বল্‌তেই তিনি মাটিতে বসে পড়লেন আর সঙ্গে

সঙ্গে দেহের বহির্দ্বার পথে তাঁর রক্তস্রাব শুরু হোল। এ ঘটনাটাও এমনভাবে ঘটল যে, কোনো চিকিৎসক ভালো ব্যবস্থা করার আগে তাঁর মুক্তি ঘটল এবং তা চরম মুক্তি !

ছোটকাকার ও তাঁর ছেলে দুটির খুনের পর যাঁরা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'একি ব্যাপার', পিসেমশায়ের মৃত্যুর কথা শুনেও তাঁরাই আবার বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলেন, 'একি ব্যাপার !' এদিকে আরো এক ব্যাপার—পিসেমশায় যতদিন পাগলা গারদে ছিলেন, ততদিন পিসিমা হাতে একগাছা নোয়া এবং চুল পাড়ের ধুতি ছাড়া অন্য সকল বিষয়েই বিধবার মতো চলেছিলেন। পিসেমশায়ের মৃত্যুর খবর শুনে তিনিও ভেঙ্গে পড়লেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে তাঁরও মুক্তি লাভ হয়।

অধর সরকার—১

পরিমল গোস্বামী

গত ১৯৫৩ সালের ৬ই জুনের ঘটনা। সন্ধ্যা প্রায় ৭টা, স্থান যুগান্তর সাময়িকী বিভাগ।

আমি টেবিলে রক্ষিত স্তূপাকার পাণ্ডুলিপি সামনে নিয়ে বসে আছি। সময় পেলেই দু'চারখানা পড়ে ফেলি। কিন্তু সন্ধ্যাবেলাটা এ কাজের উপযুক্ত নয় সাধারণত, কেননা দর্শন-প্রার্থীর ভিড় ঠিক এই সময়েই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ৬ই জুন শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। যোগাযোগ এমন যে ঠিক এই সময়েই বিভাগীয় দুজন সহকারীও কক্ষান্তরে

ছিলেন। একজন দ্বিতলে, অন্যজন পাততাড়ি বিভাগে।

সুতরাং আমি সম্পূর্ণ একা, তদুপরি বাইরে ঝড়-বৃষ্টি এবং কোনো দর্শনপ্রার্থীর আসবার সম্ভাবনা নেই, এমনি অবস্থায় কাজে মনোযোগ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত, কিন্তু রবীন্দ্রযুগে এমন বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় মনোযোগ বৃদ্ধি পায় না। মন উড়ু-উড়ু করে, মনোযোগ উধাও হয়ে যায় বিষয়ান্তরে—ঝড়ের মধ্যে, বৃষ্টির মধ্যে, বিদ্যুতের মধ্যে, গুরু-গুরু ধ্বনির মধ্যে; নানাখানা হয়ে মন হারিয়ে যায়। কিন্তু সেদিন আমি শুধু 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না' পর্যায়ের কয়েকটা গল্প পড়ছিলাম একের পর এক। গত দু'সপ্তাহের মধ্যে পড়া হয় নি একটিও, ইতিমধ্যে টেবিলে প্রায় একশত জমেছে। এই পর্যায়ের কাহিনীগুলোর মধ্যে একটা অবাস্তবতা আছে, তাই হয় তো এমন ঘন-ঘোর বর্ষা-সন্ধ্যাতেও মন সম্পূর্ণ বিক্ষিপ্ত হতে পারে নি।

পড়ে চলেছি, বিরক্ত হচ্ছি অনেক সময়। ভাবছি 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না' বলতে সবাই প্রেতমূর্তির কথাই বলছেন কেন। বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা চলে না—কথাটির উদ্দেশ্য ছিল মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বের করে আনা, যার যুক্তিসঙ্গত কোনো ব্যাখ্যা এখন পর্যন্ত দেওয়া যায়নি। তা শুধু প্রেতমূর্তি সম্পর্কেই হবে কেন।

এই সব ভাবছি, এমন সময় সর্বাঙ্গ ভিজে অবস্থায় এক ভদ্রলোক ধীরে ধীরে আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক, চেহারায় দারিদ্র্যের ছাপ। তাঁর এই অপ্রত্যাশিত

আবির্ভাব একটু বিরক্তিকরই বোধ হল সে সময়ে।

আমি তাঁর দিকে চাইতেই তিনি সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, 'দিন সাতেক আগে আমি একটি লেখা দিয়ে গিয়েছিলাম, জানতে এসেছি কি হল। আমার নাম অধর সরকার।'

সাধারণত এরকম সন্ধানকারীকে কিছু বলতে দেরি হয়, কারণ ফাইল না দেখে কিছু বলা যায় না, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁর লেখাটাই সম্মুখে পড়ে ছিল, সেটাই পড়ছিলাম।

বললাম, 'আপনি ফেরৎ নিয়ে যান লেখাটা, এটি অমনোনীত হয়েছে।'

ভদ্রলোক হতাশ হয়ে বললেন, 'কেন জানতে পারি কি?'

'সে তো বলা সম্ভব নয়। এক কথায় বলা চলে, পছন্দ হয় নি। কিন্তু তারপরে প্রশ্ন ওঠে কেন পছন্দ হয়নি। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেক সময় লাগে। কারণ, এক কথায় আর এক কথা ওঠে এবং তা থেকে আর এক কথা, কিন্তু তবু সম্পূর্ণ বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। সেজন্যে আমাদের পক্ষে লেখা অমনোনীত হওয়ার কৈফিয়ৎ দেওয়া সম্ভব হয় না।'

হতাশ হয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আমি তা শুনব না, এই গরিবের ভূতটা, সার, কি অপরাধ করেছে বলতেই হবে।'

আমি বললাম, 'তার আগে আপনি বাড়ি গিয়ে ভিজে জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলুন, এ অবস্থায় বসে থাকলে আপনিই হয়তো ভূত হয়ে যাবেন শেষটায়।'

অধর সরকার অধর দংশন করতে লাগলেন। ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'অভ্যাস আছে। কিন্তু আপনাকে বলতেই হবে লেখাটা চলল না কেন? আমি বেশি সময় নেব না আপনার।'

ভদ্রলোকের কাতরতা দেখে করুণা হল। তা ছাড়া স্পষ্টই বোঝা গেল তর্ক করতে হবে না, ছোট একটি বক্তৃতা দিলেই চলবে।

'শুনুন, আপনার এই লেখাটা সংক্ষিপ্ত। এতে শুধু আছে আপনি একটি প্রেতমূর্তি দেখেছেন এবং তাতে ভয় পেয়েছেন। শত শত লেখা আসছে ঠিক ঐ একই সংবাদ বহন করে। তা হলেই বুঝুন, এই প্রেতমূর্তি দেখার অভিজ্ঞতা আপনার ব্যক্তি-গত নয়, সাধারণের। কোনো একটা অভিজ্ঞতা যখন সবার হতে থাকে, তখন তার সংবাদে আর বৈশিষ্ট্য থাকে না।'

'বুঝলাম না কথাটা।'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরুন এই যে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র মিলিয়ে বিশ্ব-জগৎ—এর কোনো ব্যাখ্যা আছে? এই যে আপনি, আমি, আমাদের জন্ম, মৃত্যু, এর উদ্দেশ্য বোঝেন কিছু? এই যে আমার আপনার দেহ, যার মধ্যে কি বিরাট এক যান্ত্রিক কৌশলে অযুত-নিযুত কোষদেহ মিলেছে, এর কোনো ব্যাখ্যা হয়?'

'কেন, বিজ্ঞানে—'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, চেষ্টা করছে, কিন্তু অগণিত বিজ্ঞানীর

সঙ্গে শার্লক হোমস্, এরক্যুল পোয়ারো, ফাদার ব্রাউন, থর্ন-ডাইক প্রভৃতি জুটেও সব জাগতিক ঘটনার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। দেহের কথায় আসুন। বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করেছে দেহ কোন্ উপাদানে তৈরি। অনেকটা বুঝেছেও, কিন্তু সেই সব উপাদান মিলে একটি জীবন্ত মানুষ হল কি করে তার কোনো ব্যাখ্যা হয় নি। ভাবলে অবাক হবেন—আপনি আপনার নখাগ্রের একটি বিন্দুমাত্র অংশে কোটি কোটি পরমাণু বহন করে বেড়াচ্ছেন, তা দিয়ে কোটি কোটি পরমাণু বোমা তৈরি করা যায়। তা হলে দেখুন কি বিরাট অচিন্তনীয় এক শক্তি আপনার মধ্যে সংহত হয়ে আছে!—কিন্তু এ তো গেল দেহের কথা। কিন্তু তবু তো দেহের কথাও লিখছেন না 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না' পর্যায়ে?'

ভদ্রলোক উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'লিখব আমি?'

আমি বললাম, 'কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ-বিস্ময় কোথায়? সবাই জানে এর ব্যাখ্যা হয় না, তাই এ সম্পর্কে কেউ লেখে না। প্রেতমূর্তি সম্পর্কেও কি তাই হওয়া উচিত নয়? কারণ ওটাও অলৌকিক বা সুপার-ন্যাচুরাল কিছুই নয়। কোনো কোনো লোকের চোখে ছায়াছবি ফুটে ওঠে। তাতে বিস্ময় কোথায়? অলৌকিক কিছুই নেই জগতে। ঐ ছায়া মূর্তি যত অলৌকিক, আপনার আমার দেহ বা মন বা আত্মা যাই বলুন, তত অলৌকিক। অর্থাৎ অলৌকিক যদি কিছু থাকে জগতে, তা হলে তার মধ্যে আপনি আমিও আছি। কিন্তু

সবাই তা বোঝে না। তাই, দেহ নিয়ে লিখলে তা সবাই পছন্দ করবে না, বলবে ও তো সবাই জানি যে ব্যাখ্যা হয় না।'

ভদ্রলোক বললেন, 'মৃত্যুর সঙ্গে সব শেষ হয়ে যায়, এ কথা অনেকে মানতে চায় না, তাই মৃতের প্রেতাত্মা যদি কেউ দেখে, তা হলে তারা বিশ্বাসে জোর পায় বোধ হয়।'

'কিন্তু মৃত্যুর পরে আত্মা থাকে কিনা তার ব্যাখ্যা ওটা নয়। ব্যাখ্যা হয় না। যেমন ব্যাখ্যা হয় না দৃশ্য বস্তুর।'

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি দেখেছেন কখনো প্রেতমূর্তি ?'

'না।'

বিশ্বাস করেন ?'

'সম্পূর্ণ। কেননা যাঁরা দেখেন, তাঁদের দেখা মিথ্যা বলি কি করে ?'

'আপনি মৃত্যুর পরেও অস্তিত্ব স্বীকার করেন ?'

বললাম, 'করি। কিন্তু তা কীর্তির মধ্যে, কাজের মধ্যে, জীবিতদের মনের মধ্যে, বংশধরদের মধ্যে, অথবা ইতিহাসের পাতায় বা বংশতালিকায়। কিন্তু কদাপি শূন্যে নয়। অবশ্য আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু এসে যায় না। শূন্যে যদি অস্তিত্ব থাকে তবে তা একদিন প্রমাণ হবেই। অর্থাৎ তার ব্যাখ্যা হবেই, যেমন সমস্ত অব্যাখ্যাত জিনিসেরই ব্যাখ্যা হবে একদিন।'

এইবার ভদ্রলোক আমার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করে প্রশ্ন করলেন, 'প্রেতমূর্তির অস্তিত্ব যদি বিশ্ব-জগতের অস্তিত্বের মতই সাধারণ ঘটনা বলে মনে করেন, তা হলে 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না' পর্যায় চালাচ্ছেন কেন?'

বললাম, 'এই প্রশ্নেই আপনার গোড়ার প্রশ্নের উত্তর মিলবে। আমি বলি সব সাধারণ অভিজ্ঞতা বা প্রশ্নই লেখার মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ রূপ গ্রহণ করে। এই বিশেষ রূপটি যদি প্রকাশযোগ্য রূপ হয়, তা হলে জাগতিক যে-কোনো ঘটনা নিয়ে লিখলেই এই পর্যারে তা ছাপা হতে পারে। শুধু প্রেত-মূর্তির কথা লিখতে হবে এমন কথা নেই। কিন্তু লেখাটি এমন হওয়া চাই যাতে লেখকের বক্তব্য একটা পূর্ণ রূপ গ্রহণ করে পাঠকমনে। অর্থাৎ আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যদি আপনি এমনভাবে লিখতে পারেন যাতে আপনার মনের প্রশ্ন, আপনার বিস্ময়, আপনার অনুভূতি আর সবার মনে সত্য হয়ে ওঠে, তা হলেই সে লেখা প্রকাশযোগ্য হয়। বড় জাগতিক ঘটনা থেকে নেমে আসা যাক চলতি পথের বিস্ময়কর ঘটনায়। রবীন্দ্রনাথের কাছে একদিন শুনছিলাম তাঁর চিকিৎসা-বিদ্যার কথা। এক অতি কঠিন মৃতপ্রায় রোগীকে তিনি একমাত্রা বায়োকেমিক ওষুধ দিয়ে সারিয়ে তুলেছিলেন। রোগী কি করে সেরে উঠল তা তাঁর বুদ্ধির অতীত। উচ্ছ্বসিত বিস্ময়ের সঙ্গে সেই কাহিনীটি তিনি বলেছিলেন। অনেক চিকিৎসকেরাও তাঁদের এই জাতীয় অভিজ্ঞতা লিখতে পারেন এই পর্যায়ে।

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না

কিন্তু এ বিভাগটি শুধু এভিডেন্স বা ইতিহাস বা ছোট ছোট রিপোর্ট সংগ্রহের জন্যে নয়। লিখতে হবে অনেকটা গল্প লেখার টেকনীকে। পাঠকের মনে তা সত্য হয়ে ওঠা চাই, লেখকের বিস্ময়ও পাঠকমনে কিছু সঞ্চারিত হওয়া চাই। আপনি শুধু একটি ঘটনা সংক্ষেপে রিপোর্ট করেছেন মাত্র। তাই এ লেখা মনোনীত হয় নি।'

বাইরে বৃষ্টির বেগ ইতিমধ্যে আরও একটু বেড়েছে। আমি মাথা নিচু করে টেবিলের পাশে পাখার হাওয়ার আড়ালে একটি চুরুট ধরিয়ে নিচ্ছিলাম। ঝড়বৃষ্টির জন্যে সবগুলো জানালাই বন্ধ ছিল, তাই পাখা চলছিল। ভাবছিলাম ভদ্রলোককে এক পেয়ালা চা খাওয়ানো উচিত, ভিজে পোষাকে বসে আছেন।

'চা খাবেন এক কাপ?'

বলে তাঁর দিকে তাকাতেই দেখি কেউ কোথায়ও নেই। শূন্য ঘরে আমি একা বসে আছি।

কি ব্যাপার! ভদ্রলোক মিলিয়ে গেলেন কোথায়? এটাও কি ভৌতিক ব্যাপার?

লাফিয়ে উঠে ছুটে গেলাম বাইরে, দেখি বেয়ারা দরজার পাশে টুলের উপর ঝিমচ্ছে। এগিয়ে গেটের কাছে গেলাম। দুপাশে দরোয়ানেরা বসে গল্পে মেতেছে। বাইরে বৃষ্টির নিরেট প্রাচীর। জিজ্ঞাসা করলাম 'কাউকে যেতে দেখেছ এখনি?'

ওরা বললে খেয়াল করে নি কেউ।

তবে কি আমিই একটু ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম? কিংবা জাগ্রত স্বপ্ন? কিন্তু আমি চুরুট খাচ্ছি ঠিকই, এবং চেয়ারখানাও ভিজে।

অধর সরকার—২

পরিমল গোস্বামী

‘বুদ্ধিতে যার ব্যখ্যা চলে না’ পর্যায়ে ‘অধর সরকার’ নামক কাহিনীটি প্রকাশিত হবার পর পাঠকদের কাছ থেকে অনেক চিঠি আসে। তাঁরা নানা রকম সন্দেহ প্রকাশ করেন। আমি তাঁদের সন্দেহ দূর করার অভিপ্রায়ে ‘সাময়িকী’তে ঘোষণা করি তাঁদের প্রশ্নের জবাব দেব। যদিও ‘অধর সরকার’ কাহিনীতে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না, তবু জবাব দেওয়া কর্তব্য মনে হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে যাতে আমার আর জবাব দেবার প্রয়োজন

নেই। ঘটনাগুলো এই :

সেই সপ্তাহের বুধবার দিন রাত্রি ৮টায় যখন উঠতে যাচ্ছি ঠিক সেই মুহূর্তে এক বলিষ্ঠকায় ইংরেজের আবির্ভাব ঘটল সাময়িকী বিভাগে। এ বিভাগে ইংরেজের আবির্ভাব সব সময় প্রত্যাশিত নয়, তাই আমাকে থামতে হল।

পরিষ্কার বাংলায় 'ভিতরে আসতে পারি কি?' বলতে বলতেই তিনি ঘরে প্রবেশ করে বিনা ভূমিকায় নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন, 'আমি সোজা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে আজই এসে পৌঁছেছি কলকাতায়। উদ্দেশ্য : অধর সরকার সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।' বলেই তিনি পাশের শূন্য চেয়ারখানায় বসলেন এবং আমাকে বসতে বললেন।

আমি বসবার পর তিনি বলতে লাগলেন, আমি যুগান্তর অফিসে এসেই প্রথমে উপরে গিয়ে সহকারী সম্পাদকদের কাছে সন্ধান করি। জানতে পারি—অবশ্য অনেক জেরার পরে—অমর সরকার নামক এক দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক কমার্স বিভাগের সম্পাদকের কাছে এসে তাঁর একটি অমনোনীত লেখা ফেরৎ নিয়ে গেছেন। সেখান থেকে আমি নিচে এসে যাই দারোয়ানদের কাছে। ৬ই জুন তারিখে যখন বৃষ্টি হচ্ছিল সে সময় তারা দাড়িওয়ালা কোনো ভদ্রলোককে বেরিয়ে যেতে দেখেছে কিনা প্রশ্ন করি। প্রথমে তারা কিছুই মনে করতে পারে না। তারপর অনেক ইঙ্গিত করার ফলে তাদের মনে

পড়েছে যে একটি দাড়িওয়ালা লোক সেদিন বৃষ্টির মধ্যে সত্যিই বেরিয়ে গিয়েছে তাদের সম্মুখ দিয়ে। ঘটনা অত্যন্ত পরিষ্কার। আমার থিয়োরি হচ্ছে, সেই ভদ্রলোকই এসেছিলেন আপনার কাছে। তাঁর নাম অধর সরকার। বুঝতে পারছেন না বোধ হয়। ঘটনাটা হচ্ছে এই ঃ একই লেখক অনেক সময় বিভিন্ন নামে একই কাগজে লেখা পাঠান। অনেক পুরুষ লেখক স্ত্রীলোকের নামও গ্রহণ করেন; এই শেষের ক্ষেত্রে লেখা পড়লেই বোঝা যায়। ইন্টারন্যাল এভিডেন্স অত্যন্ত স্পষ্ট।'

তারপর একটু মৃদু হেসে বললেন ঃ 'বাংলা সংস্কৃত এবং এ দেশী অন্যান্য অনেক ভাষাই আমি জানি, যুদ্ধের সময় এখানেই ছিলাম। পুরুষ লেখক মেয়ের নামে লিখতে 'শ্রীমতি' এই ভুল বানানে লিখেও অনেক সময় ধরা পড়ে। কিন্তু অবান্তর কথা থাক। কথা হচ্ছে, একই লেখক অনেক সময় বিভিন্ন নাম গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু এই জাতীয় অনেক লেখক অত্যন্ত ভীরু এবং লাজুক প্রকৃতির। তাই সর্বত্র ব্যর্থ হওয়ার লজ্জা আত্ম পরিচয়ে সবার কাছে প্রকাশ করতে চান না। আপনার অধর সরকারও এই জাতীয় লেখক। ইনিই উপরে দাড়ি-সম্বলিত অমর সরকার ছিলেন, নিচে আপনার ঘরে আসবার সময় ইনিই দাড়ি খুলে অধর সরকার হয়েছিলেন এবং বেরিয়ে যাবার সময় পুনরায় অমর সরকার রূপে বেরিয়ে গেছেন। সামান্য কমন সেন্স দিয়ে ব্যাখ্যা করে গেলাম। গুড নাইট।'

আমি তো অবাক! কিন্তু বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ চলে যাবার পরেই প্রবেশ করলেন আর এক ইংরেজ। দীর্ঘদেহ, কোমল অথচ বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, মুখে পাইপ। ইনি ইংরেজীতে কথা বললেন। উচ্চারণ মধুর কিন্তু দৃঢ়। বললেন, 'বেকার ষ্ট্রীট থেকে আসছি।'

বেকার ষ্ট্রীটের নামে চমকে উঠে বললাম, 'আপনি কি তবে মিস্টার শার্'—

—'লক হোম্স্—সময় বেশি নেই, তাই পাদপূরণ করে সময় সংক্ষেপ করলাম। আপনাকে তুটো প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য আছে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের লোক এসেছিল দেখলাম। কেন যে বৃথা এলে। কিন্তু যাক, আপনি 'অধর সরকার' কাহিনীর শেষ লাইনে যে লিখেছেন 'চেয়ারখানাও ভিজে'—শুধু এরই মধ্যে আমার সূত্র পাব মনে করেই ছুটে এলাম বিলেত থেকে। যা ভেবেছি তাই, সূত্র পেয়েছি। সম্পাদকের সামনে একখানা মাত্র চেয়ারই যে থাকে না এটা এক রকম ধরেই নিয়েছিলাম, শুধু আপনার ঘরখানা দেখা দরকার ছিল। যখন কোনো কাহিনী লেখেন তখন পারিপার্শ্বিকের পুরো বর্ণনা না লিখলে কাহিনী সত্য হয় না। কাহিনী রচনার এই প্রাথমিক রীতিটি মনে রাখবেন ভবিষ্যতে। আপনার ঘরের সম্পুর্ণ বর্ণনা দেওয়া উচিত ছিল আপনার লেখায়। দেখছেন না উপর দিকের ঐ স্কাইলাইটের কাঁচে একটুখানি ফুটো আছে, আর আপনার চেয়ার চারখানা?'

'কিন্তু এর সঙ্গে 'অধর সরকারের' যোগসূত্রটি কোথায়?'

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না।

আমি প্রশ্ন করলাম।

শার্লক্ হোমস্ এ কথায় শুধু একটু মধুর রহস্যময় হাসি হাসলেন। বললেন, 'কিছুক্ষণের জন্যে একখানা খালি ঘর দিতে পারেন? মাত্র আধ ঘণ্টার জন্যে?'

আমি তাঁকে পাশের ঘরে নিয়ে বসিয়ে দিলাম, ঘরখানা তখন শূন্য ছিল। শার্লক হোমস্ টেবিলে পা তুলে আরাম করে পাইপ টানতে লাগলেন চোখ বুজে।

আমি অপেক্ষা করছি আমার ঘরে। এমন সময় মাত্র মিনিট দশেক পরে পদশব্দে চমকে উঠে দেখি তিনি ফিরে এসেছেন। আমি তাঁর দিকে চাইতেই তিনি বললেন, 'মনে কিছু করবেন না, কর্তব্যের খাতিরে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি —আপনি কি আফিং খান?'

আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম 'কখনো না।'

'ধন্যবাদ'—বলে তিনি আবার ফিরে গেলেন। ঠিক আধ ঘণ্টা পরে তিনি ফিরে এলেন বিজয়ী বীরের মতো। এসেই বললেন 'অধর সরকার মিথ্যা। সে মানুষও নয়, ভূতও নয়। যদি মানুষ হত তা হলে আপনাকে না জানিয়ে হঠাৎ উঠে যেত না। অর্থাৎ মোটিভের অভাব। কারণ যে লোকটি এমন কাতরভাবে লেখা ছাপানোর জন্যে আবেদন জানায়, সে আর একবার চেষ্টা না করে উঠত না। আর যদি সে ভূত হত তা হলেও মোটিভের অভাব। ভূত কেন গল্প লিখবে? বিশেষ করে ভূতের গল্প? ওটা মানুষেই লেখে। ভূতের যদি

লেখার ক্ষমতা থাকত, তা হলে ভাল লেখারও ক্ষমতা থাকত, না থাকলেও সে গল্প ছাপানোর জন্য হ্যাংলামি করত না মানুষের মতো, একেবারে সম্পাদকের ঘাড়ে চেপে বসত।'

আমি প্রশ্ন করলাম 'তা হলে চেয়ার ভিজে ছিল কি করে?'

শার্লক হোমস্ বললেন, 'আপনার লক্ষ্য করা উচিত ছিল চেয়ার চারখানাই ভিজে ছিল। আপনি তাকে যে চেয়ারে বসতে দেখেছিলেন মাত্র সেইখানাই লক্ষ্য করেছিলেন, চারখানা একসঙ্গে লক্ষ্য করেন নি। ঝড় প্রবল হলে ঐ ভাঙা স্কাইলাইট থেকে জলের ছাট এসে চারখানা চেয়ারকেই ভেজাবে।'

'কিন্তু যে অধর সরকারকে মিথ্যা বলছেন, তাকে আমি চেয়ারে বসে থাকতে দেখেছি, একথা আপনি অস্বীকার করছেন কোন্ যুক্তিতে?'

'কোন্ যুক্তিতে? যুক্তি অতি প্রবল: আপনি দিবা-স্বপ্ন দেখেছেন। আমি শুধু সাদা ভাষায় বলে যাচ্ছি যে আপনার অধর সরকারকে ব্যাখ্যা করতে যথেষ্ট বুদ্ধির দরকার নেই। গুড নাইট।'

শার্লক্ হোমস্ চলে যেতেই দেখি আবার একজন কেশ-বিরল মাথা, বেঁটে ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। তিনি ইংরেজীতে পরিচয় দিয়ে বললেন, তিনি জাতিতে ফরাসী, নাম এরক্যুল পোয়ারো। তিনি এসেই চারদিকে দৃষ্টিপাত করে নিলেন এবং

একখানা চেয়ারে বসে বললেন, 'শার্লক্ হোমস্ যে আসবে জানতাম। কিন্তু অতি-লজিক ওর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়েছে। সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ভদ্রলোক বেশ ওস্তাদ, কিন্তু শুধু লজিকের পথে চললে মূলে ভুল হয় অনেক সময়। আমাদের ফরাসী কৌশলে বিশুদ্ধ শুক্‌নো লজিকের স্থান নেই। Eh bien ! আপনার অধর সরকার পড়েছি। আপনাকে একটিমাত্র প্রশ্ন আছে আমার। প্রশ্নটি এই যে, অধর সরকাবকে আপনি আপনার কাহিনীতে যা যা শুনিছেন তার চেয়ে বেশি আর কিছু কি আপনার বলবার ছিল না ?'

'ছিল।'

'বলেন নি কেন ?'

প্রশ্নটি এমন মাবাত্মক যে, আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়বৎ চুপ করে রইলাম। আমি নিজে বুঝতে পারছিলাম আমি পরাজিত হয়েছি। মঁসিয়ো পোয়ারো আমাব অবস্থা বুঝতে পেরে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন। সম্পূর্ণ অবান্তর প্রসঙ্গ। ভারতবর্ষে ফরাসী উপনিবেশগুলোর বর্তমান পরিণতি বিষয়ে আলাপ চলল কয়েক মিনিট। কথা শেষ করে আমার চোখের দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর উঠে মৃদু হেসে bon soir বলে পা বাড়ালেন।

আমি তাঁর পথ আটকালাম। বললাম, 'আপনি তো কিছুই বলে গেলেন না ?'

Eh bien ! আপনি তো আগাগোড়াই একটি গল্প রচনা

করেছেন। লেখকদের কাছে আপনাব কিছু বলবার ছিল, সেটি সোজা ভাষায় না বলে একটি গল্পের আকারে বলেছেন। আরও অনেক কথা আপনার বলবার ছিল, কিন্তু কাগজে জায়গা কম, তাই দু-কলমের মধ্যে শেষ করেছেন। Bon soir!

মঁঃ পোয়ারো একটি খরগোসের গতিতে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। আমিও, কিন্তু কচ্ছপের গতিতে।